ওয়ারেন বাফেটের ম্যানেজমেন্ট সিক্রেটস

মেরি বাফেট ও ডেভিড ক্লার্ক

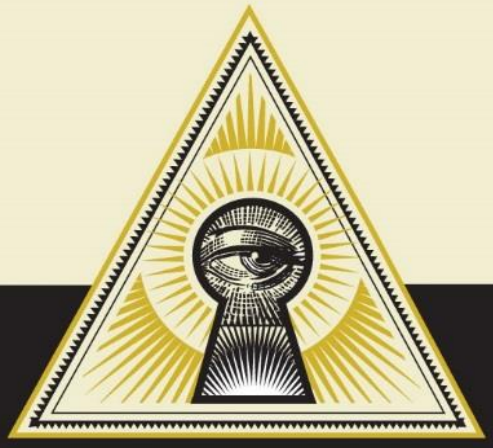

PROVEN TOOLS FOR PERSONAL AND BUSINESS SUCCESS

ট্রান্সক্রিয়েশন: জায়েদ ইবনে আবুল ফজল

ম্যানেজমেন্ট সিক্রেটস

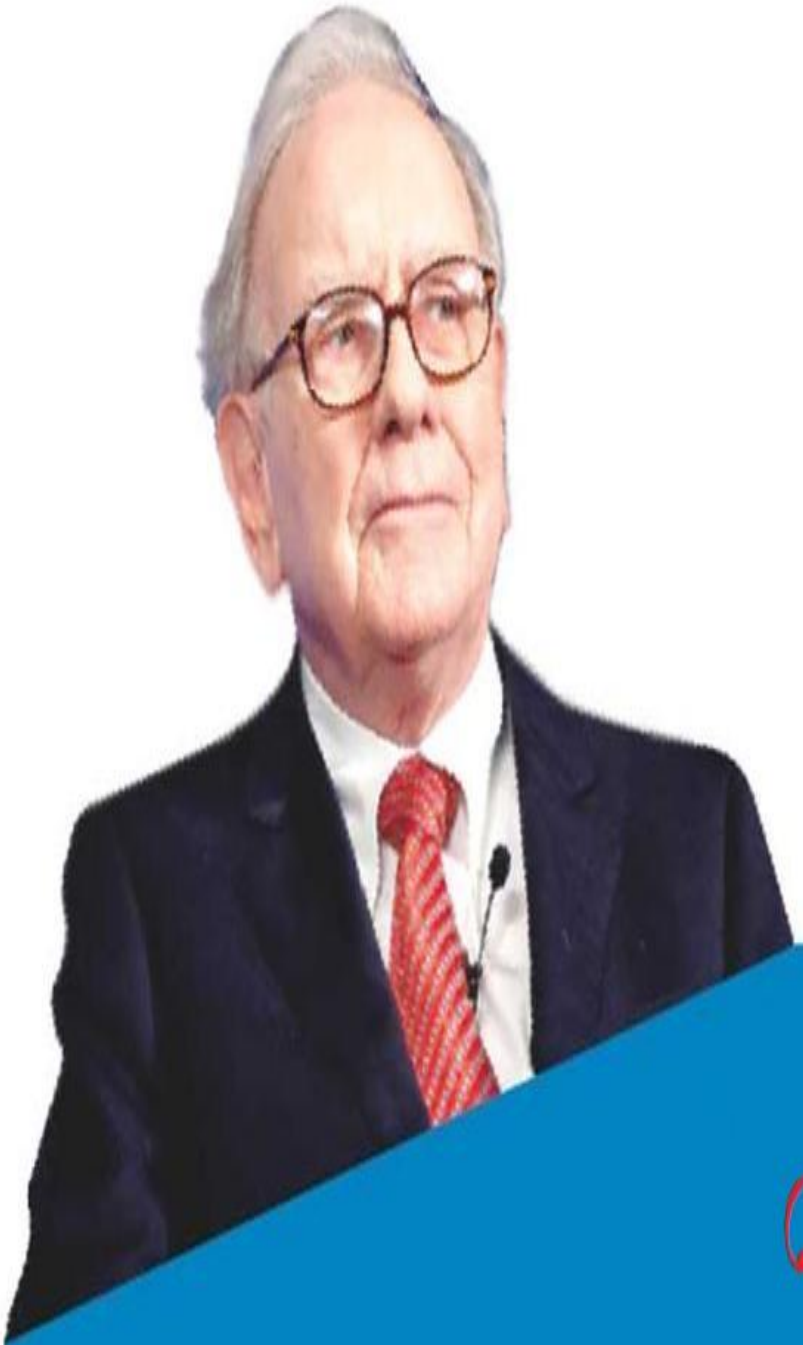

নাম ওয়ারেন বাফেট, মিডিয়া ডাকে ওমাহার জাদুকর নামে। জাদুকরই বটে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুইংগাম, পত্রিকা বেচা মানুষটি আজ দুনিয়ার শীর্ষ ধনী

কোন কৌশলে তিনি পৌছলেন উন্নতির শিখরে? শুধুই কি কাণ্ডজ্ঞান? নাকি আরও কিছু...

বাফেটের ম্যানেজমেন্ট সিক্রেটস

মেরি বাফেট ও ডেভিড ক্লার্ক

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

This PDF created by: Md. Atikuzzaman

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

Facebook: https://www.facebook.com/comrade.atik

ক্যারিয়ারের জন্য কেমন প্রতিষ্ঠান ভালো?

শেয়ারে বিনিয়োগকারী হিসেবে ওয়ারেন বাফেটের খ্যাতি কিংবদন্তির মতো; ম্যানেজার হিসেবে তিনি ফার্স্ট ক্লাস। বাফেটকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নিজের কোন সত্তাটি তার বেশি পছন্দের? বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো সফলতা। অনেক ভুল রয়েছে 'বিনিয়োগকারী বাফেটে'র ট্র্যাক রেকর্ডে। কিন্তু ম্যানেজার হিসেবে? ধরা যাক, বাফেট নামের কোনো বিনিয়োগকারী নেই। এ নামে একজন ম্যানেজার শুধু আছেন, যিনি বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে চালাচ্ছেন। কোম্পানিটির ইতিহাস বলছে, ১৯৭৯ সালে তার অ্যানুয়াল অপারেশনাল নিট ইনকাম ছিল শেয়ারপ্রতি ১৮ ডলার। সেটি ৪ হাজার ৯৩ ডলার হয়েছে ২০০৭ সালে এসে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, আয়ের গড় প্রবৃদ্ধি বছরে ২০ শতাংশের বেশি। 'বিনিয়োগকারী বাফেটে'র সাফল্য কিন্তু এত উজ্জ্বল নয়। তার মতে, ভালো ম্যানেজার না হয়ে ভালো বিনিয়োগকারী হওয়াটা কঠিন। সে জন্য যারা তার কাছে বিনিয়োগে সফল হওয়ার টিপস চান, তাদের তিনি বলেন— আগে ভালো ম্যানেজার হও।

প্রায় আড়াই লাখ কর্মচারী আর শ-খানেক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান তার। সেগুলো ম্যানেজ করেন কীভাবে? বাফেট বলেন, প্রথমে চিন্তা করতে হবে— কী চাই আমি। কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ততা ক্যারিয়ারের জন্য ভালো? প্রতিষ্ঠান আছে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের। কিছু আছে, যারা দাঁড়াতেই পারে না। সেগুলো মাত্র কিছু দিন বাজারে থাকে। খরচাপাতি করে, হালকা প্রচারণাও চালায়। হারিয়ে যায় তারপর। এ ধরনের কোম্পানির ধারেকাছেও না ঘেঁষাটা মঙ্গলজনক। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো আপাদমস্তক শ্বেতহস্তী। ব্যয় করে প্রচুর, লাভ কম। অবস্থার তেমন অবনতি হয় না এগুলোর কিংবা এক জায়গায় আটকে থেকে উন্নতি করে খুব ধীরে। বাফেটের পর্যবেক্ষণ, আবার কিছু প্রতিষ্ঠান থাকে 'বুম-বাস্ট সাইকেলে'। একবার মুনাফায় স্ফীত হয়, পরমুহূর্তেই যায় চুপসে। এখানে চাকরি নিলে প্রথম দিন কৃতিত্বের জন্য বাহবা মিলবে। পরদিন অফিসে এসে দেখবেন, চাকরি নেই।

এক ধরনের কোম্পানির অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক অর্থনীতি এতটাই ভালো থাকে যে, এগুলোকে

ধাক্কা দিতে হয় না; বিপুল খরচাপাতিও লাগে না। এরা নিজে থেকেই পুঁজি বাড়িয়ে তোলে। পরিস্থিতি যত খারাপই হোক, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বাজারে। এমন কোম্পানির বড় পদে কোনো নির্বোধকে বসানো হলেও তাতে চমৎকৃত হন আশপাশের সবাই। মনে হয়, এ লোক তো ছদ্মবেশী জিনিয়াস! উদাহরণ দেব? পেপসির সিইও বানিয়ে দিন কোনোমতে সই করতে পারে এমন কাউকে। তাকে দেখে মুগ্ধ হবেন এক বছরের মধ্যে। ওই ব্যক্তিও থাকবেন মহানন্দে। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি নিয়ে টেনশনও থাকবে না তার। কিছু বিষয়বুদ্ধি থাকলে মাথায় চিন্তা আসবে— উদ্বৃত্ত পুঁজি দিয়ে নতুন ব্যবসা শুরুর, নিদেনপক্ষে লোকসানি কোনো কোম্পানি কিনে নেয়া যায় কি না। এবার জেনারেল মোটরসের সিইও পদে বসান নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটকে। তার ঘুম হারাম হয়ে যাবে। সারাক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখবেন, টয়োটা-বিএমডব্লিউ তাকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে রেসে। কিছুদিন পর পরিচালনা পর্ষদ বসে সিদ্ধান্ত নেবে তাকে ছাঁটাই করো। এ লোকের নিজস্ব চিন্তাশক্তি নেই। পড়াশোনাও খুব একটা করেনি মনে হয়; শুধু কীভাবে যেন বাগিয়ে নিয়েছে ওজনদার সার্টিফিকেট! পেপসির মতো কোম্পানির ওই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বাফেট বলেন, ডিউরেবল কম্পিটেটিভ অ্যাডভান্টেজ। ক্যারিয়ার গড়তে সবচেয়ে উপযোগী হলো এ ধরনের প্রতিষ্ঠান। কীভাবে বুঝবেন এ 'অ্যাডভান্টেজ' আছে কোন প্রতিষ্ঠানের? এ ক্ষেত্রে টাইপ আছে তিনটি। এক, যারা নির্দিষ্ট পণ্য বেচে। যেমন কোকাকোলা, পেপসি। কোমল পানীয় কিনে কাউকে খাওয়াতে বা নিজে খেতে চাইলে এ দুটির কথা মাথায় আসবেই। চুইংগাম চিবোবেন? আমেরিকানদের ব্রেইন সিগন্যাল দেবে— 'রিগলি'। একই কথা মার্লবোরো সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফিলিপ মরিসের বেলায়ও প্রযোজ্য। ভোক্তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এদের তৈরি পণ্যের ওপর। তাতে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের স্থায়ী চাহিদা। এটি বোঝা যায় আইরিশ সাহিত্য পাঠেও। কোনো উপন্যাস বা গল্পের দৃশ্য হয়তো এমন— বৃষ্টির দিন বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। গল্পের চরিত্র আকুলি-বিকুলি করছে নিকটস্থ পাবে যেতে। কেন? একটু আগুন পোহাবে আর কয়েক মগ 'গিনিজ' বিয়ার খাবে। আর কোনো বিয়ার কি নেই? আছে, তবে প্রায় আড়াই শ বছর ধরে বিয়ারের কথা মনে হলেই আইরিশদের মাথায় ভাসে গিনিজের ট্রেডমার্ক। তাদের এমন নির্ভরশীলতাই বাড়িয়ে চলেছে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদ। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যারা ডাক্তার ও আইনজীবীর মতো বিশেষ সেবা দেয়। যেমন রেটিং কোম্পানি মুডিস কিংবা করদানে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এইচঅ্যান্ডআর ব্লক। 'মন্দা' বলে কোনো শব্দ নেই তাদের ডিকশনারিতে। কারণ এ কোম্পানিগুলো 'পিপল' নয়, 'ইনস্টিটিউশন স্পেসিফিক'। চিফের চেহারা ও আচার-ব্যবহার ভালো না হলেও মুডিসের নিউইয়র্ক শাখা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে পারার বড় সুবিধা— আপনি কী করছেন, তা কেউ আমলেই নেবে না। প্রতিষ্ঠানের গুডউইল টেনে নিয়ে যাবে আপনার ক্যারিয়ার। আরেকটি স্বস্তি হলো, মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভাঙবে না— শ্রমিক ইউনিয়ন কীভাবে সামলাব, ঋণ কোথা থেকে পরিশোধ হবে ভেবে।

তৃতীয় ক্যাটাগরিতে রয়েছে ওয়ালমার্ট, নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্ট (এনএফএম), বোরশিমস ফাইন জুয়েলারি, বার্লিংটন নর্দান সান্টা ফের মতো প্রতিষ্ঠান, যারা কম দামে পণ্য কেনে বা বেচে। এসব কোম্পানির প্রধান পুঁজি হলো 'এখানে সুলভ মূল্যে মানসম্মত পণ্য মেলে'— এ পরিচিতি। ওমাহায় এমন মানুষ প্রচুর আছে, যারা স্টোভ কিনতেও বাড়ির পাশের দোকানটি ফেলে ছুটে যায় এনএফএমে। আবার মালপত্র পরিবহনের প্রশ্ন এলে এদের অনেকে বন্ধুকে যেচে পরামর্শ দেয়— বার্লিংটন নর্দানে যাও, দায়িত্বশীল সেবা পাবে। ক্যারিয়ার গড়তে অনেক বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়েও ভালো এগুলো। বাফেটের পরামর্শ, কেউ সফল ক্যারিয়ার (বিনিয়োগ, চাকরি যে ক্ষেত্রেই হোক) গড়ে তুলতে চাইলে তার উচিত হবে এ তিন টাইপের কোনো একটিকে নিজের জন্য বেছে নেয়া।

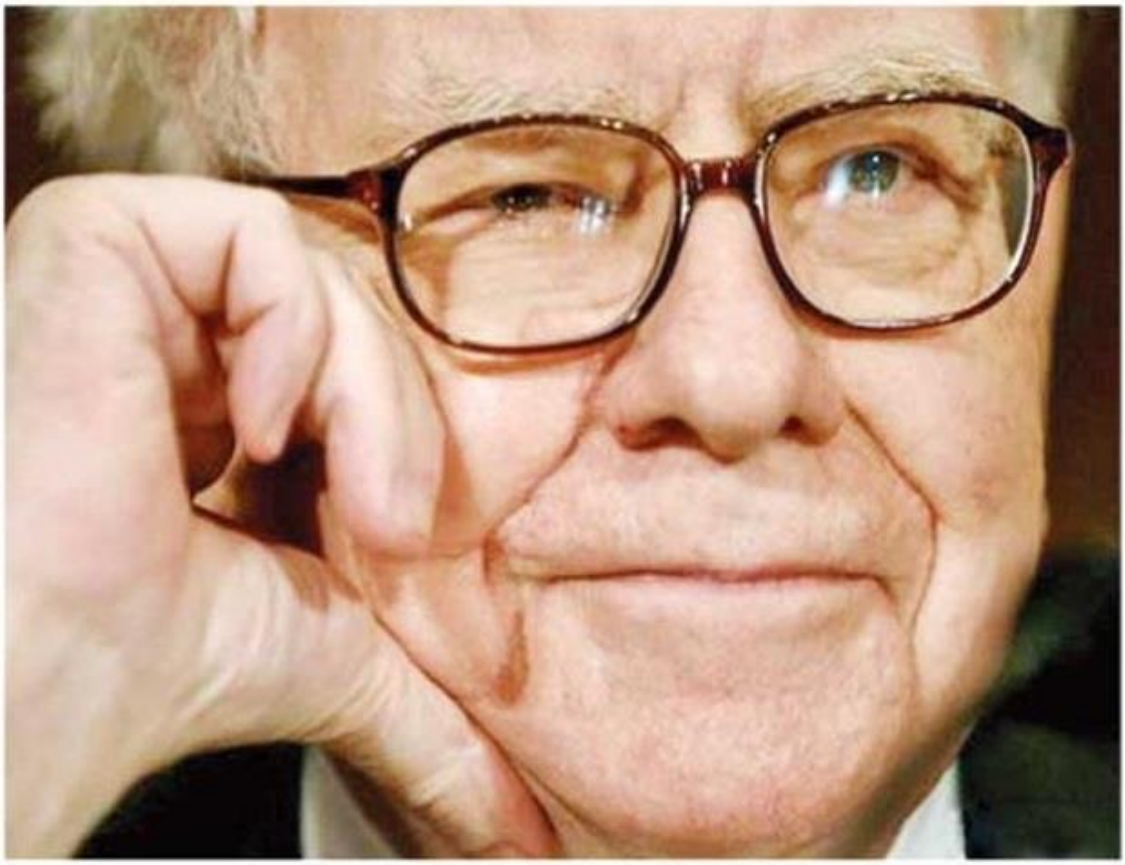

রাফ খাতায় সহজ তিন টেস্ট

কোনো কোম্পানির ডিউরেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভানটেজ নির্ণয়ের অনেক টেস্ট রয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষায় তা শেখানোও হয়। তবে সেগুলো ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা কঠিন। এসবে রয়েছে গাণিতিক জটিলতা। ফলে সতর্ক না হলে ফল ভুল হবে। এ জন্য বাফেট নিজে অনুসরণ করেন তিনটি সহজ টেস্ট। যারা ক্যালকুলেটরের বোতাম চেপে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারেন, তাদের পক্ষেও হিসাবগুলো করা খুব সহজ।

প্রথম টেস্ট— কোম্পানির শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব। কোম্পানিগুলো তো আজকাল এ ধরনের তথ্য দিচ্ছে ওয়েবসাইটে। এ ক্ষেত্রে কেবল এক বছরের শেয়ারপ্রতি আয়ের তথ্য যথেষ্ট নয়। যত অধিক বছরের তথ্য পাওয়া যাবে, হিসাব হবে তত নিখুঁত। বাফেটের টেকনিক হলো, কমপক্ষে ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করা। তার রাফ খাতায় একটি কোম্পানির নামের নিচে লেখা ছিল— ১৯৯৯ সালে ১ দশমিক ৩, ২০০০-এ ১ দশমিক ৪৮, ২০০১-এ এসে ১ দশমিক ৬, ২০০২-তে ১ দশমিক ৬৫, ২০০৩-এ ১ দশমিক ৯৫, ২০০৫-এ ২ দশমিক ১৭, ২০০৬-এ ২ দশমিক ৩৭, ২০০৭-এ ২ দশমিক ৬৮ ও ২০০৮-এ শেয়ারপ্রতি আয় ২ দশমিক ৯৫ ডলার। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি আয়ে ক্রমোন্নতি স্পষ্ট। এটি প্রতি বছরই আয় করেছে আর সামান্য হলেও তা আগেরবারের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ কোম্পানির আয় বৃদ্ধি স্থিতিশীল। এমন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যারাই থাকুন, বেশি ঝুঁকি নিতে হয় না তাদের। বাজারে টিকে থাকতে পণ্যের ডিজাইন পরিবর্তন বা জোরদার বিপণন কর্মসূচি নিয়েও দৌড়াতে হয় না খুব একটা। আবার আয়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বলে দেয়, কোম্পানির অন্তর্নিহিত অর্থনীতিটি শক্তিশালী। ফলে ম্যানেজমেন্ট থেকে মনোযোগ কিছুটা সরিয়ে বোর্ড দৃষ্টি দিতে পারে কৌশলগত ব্যয় বাড়ানোর দিকে (প্রতিষ্ঠান কিনে নেয়া, নতুন ব্যবসা খোলা প্রভৃতি)। আবার কিছু

প্রতিষ্ঠানের শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব অনেকটা এ রকম— ১৯৯৯ সালে ৮ দশমিক ৫৩, ২০০০-এ ৬ দশমিক ৬৮ (লস), ২০০১-এ ১ দশমিক ৭৭ (লস), ২০০২-এ ৩ দশমিক ৩৫, ২০০৪-এ ৬ দশমিক ৩৯, ২০০৫-এ ৬ দশমিক শূন্য ৫ (লস), ২০০৬-এ ৩ দশমিক ৮৯, ২০০৭-এ দশমিক ৪৫ (লস) ও ২০০৮ সালে ২ দশমিক ৫০ ডলার। অনেকে ভাবতে পারেন, এক-দুই বছর লস করেছে তো কী? প্রতিষ্ঠানটি তো ভালো মুনাফাও করেছে মাঝে মধ্যে। বিভ্রান্ত হবেন না। এ কোম্পানি পড়েছে বুম-বাস্ট সাইকেলে। বুম হলে চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে বেচা-বিক্রি এবং মুনাফা করছে কোম্পানিটি। সমস্যা হলো, বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা দেখে সীমা অতিক্রম করে ফেলে এসব প্রতিষ্ঠান। মুনাফা দেখে উৎপাদন বাড়াতে যায়; বাড়তি লোক নেয়, নতুন মেশিনপত্র বসায়। এখানে একটি মজার বিষয় রয়েছে। ওসব প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বাড়ানোয় অনেক ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবার দাম যায় কমে। বুমই তাদের ঠেলে দেয় বাস্টের পথে। এরা তখন দিশেহারা হয় বাড়তি লোকবল ও নতুন মেশিনপত্র বাবদ ব্যয় সামলাতে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে লাগামছাড়া বিনিয়োগ করুন বা একে ঘিরে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখুন— আপনার ভবিষ্যৎ ফর্সা হয়ে যাবে। বাফেট নিজেও এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে লোকসানে পড়েছিলেন।

কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ হলো দ্বিতীয় টেস্ট। কোনো প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বড় ঋণ থাকার অর্থ— হয় ব্যবসাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক (তার মানে মুনাফা বাড়াতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালাতে হবে বিনিয়োগকারীকে); নয়তো এটি জলহস্তী। সারা বিশ্বে বহু প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোই এমন, আয়ের তুলনায় বেশি হয়ে যায় তাদের ব্যয়। 'এক্সট্রা-লার্জ' সাইজ হওয়ায় এগুলো নড়াচড়া করতে পারে না; খাইয়ে দিতে হয় মুখে তুলে। এখানে কাজ হয় কম, আড়ম্বরের শেষ নেই। আউটলেট বন্ধ থাকলেও উৎসবের রাতে ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে রাখে এরা। মন্দা দেখা দিলে এসবে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয় আগে। বিনিয়োগ বা চাকরির নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ হলে এগুলোর কাছেও যাওয়া যাবে না। বাফেটের থিওরি হলো, কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিট আয়ের পাঁচ গুণের বেশি হওয়ার অর্থ এটি জলহস্তী। আর এখানে বিনিয়োগ করা মানে সাঁতার না জেনে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া।

আরেকটি টেস্ট, কোম্পানির গ্রস প্রফিট মার্জিন নির্ণয়। এটিও হিসাব করা সহজ। সে জন্য প্রথমে দরকার কোম্পানির বার্ষিক আয় বিবরণী। ধরা যাক, এক প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ১০ লাখ ডলার। এদিকে মজুরি, বিপণন ব্যয়সহ একই বছর তাদের ব্যয় ৬ লাখ ডলার সাকুল্যে। এ ক্ষেত্রে ৪ লাখ ডলার হাতে থাকবে আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করলে। এটিই কোম্পানির গ্রস প্রফিট। অবশ্য এটি দেখে প্রতিষ্ঠানের ডিউরেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভানটেজ নির্ণয় করা যায় না। এটি পাওয়া যায় গ্রস প্রফিট মার্জিন থেকে। এ অবস্থায় গ্রস প্রফিট ৪ লাখকে মোট আয় ১০ লাখ ডলার দিয়ে ভাগ ও প্রাপ্ত ফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে উত্তর আসবে ৪০ শতাংশ। আলোচ্য কোম্পানির গ্রস প্রফিট মার্জিন এটি। বাফেট বলেন, টেস্টটি কোনো কোম্পানির ডিউরেবল অ্যাডভানটেজ নির্ণয়ের শর্টকাট। শেয়ারপ্রতি আয়ের মতো এ ক্ষেত্রে ১০ বছরের তথ্য-উপাত্ত লাগে না। যেকোনো একটি বছরের আয় বিবরণী থাকলেই চলে। বাজারে পণ্য বা সেবার দাম নির্ধারণে কোম্পানি কতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে, তাও বোঝা যায় এ থেকে। ওয়ারেন বাফেটের মতে, সফল প্রতিষ্ঠানের গ্রস প্রফিট মার্জিন থাকে সাধারণত ৫০-এর ওপর। বিনিয়োগের আগে তিনি এ ছোট্ট হিসাবটি সেরে নেন। তার রাফ খাতায় লেখাই আছে অনেক প্রতিষ্ঠানের গ্রস প্রফিট মার্জিন। তার নোটসহ সেখান থেকে কিছুটা তুলে ধরা যায়। কোকাকোলার গ্রস প্রফিট মার্জিন ৬০ (স্থিতিশীল), রেটিং কোম্পানি মুডিস ৭৩, বার্লিংটন নর্দান রেলরোড ৬১ ও রিগলি গামের ৫১ শতাংশ প্রভৃতি। ঝুঁকিপ্রবণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় গ্রস প্রফিট মার্জিনের উল্লেখ ছিল এভাবে— ইউনাইটেড এয়ারলাইনস (আপদমস্তক দেউলিয়া) ১৪, জেনারেল মোটরস ২১ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত) ও ইউএস স্টিল ১৭ শতাংশ (মাঝে মধ্যে লোকসানেও পড়ে)। মজার একটি বিষয় দেখা গেল বাফেটের খাতায়। গাড়ির চাকার ব্যবসার নির্দিষ্ট সিজন নেই। অনেকের ধারণা, সারা বছরই যেহেতু চলে; এ ব্যবসায় লস নেই। আসলে ধারণাটি ভুল। বাফেট উল্লেখ করেছেন, গুডইয়ার টায়ারের গ্রস প্রফিট মার্জিন ২০ শতাংশ। তার মানে, এ ধরনের ব্যবসার অন্তর্নিহিত অর্থনীতি শক্তিশালী নয়। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের গ্রস প্রফিট মার্জিনও নির্ণয় করা যায় এভাবে। প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্য এড়িয়ে চলেন বাফেট। ফলে এ শিরোনামের পাশে লেখা— 'ঠিকমতো বুঝি না'।

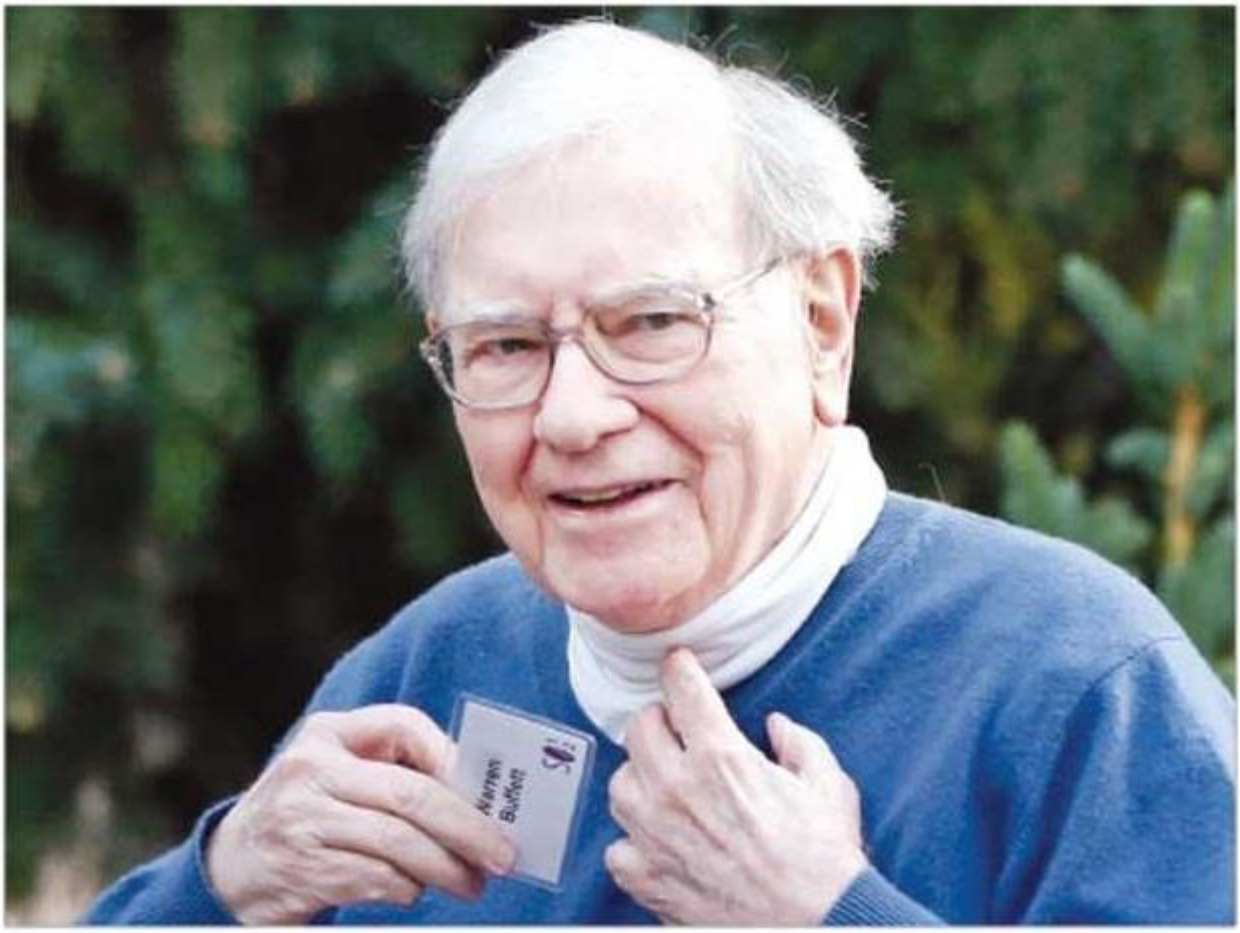

কাজ নয়, দায়িত্ব দিন ম্যানেজারদের

বাফেট যখন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কেনেন, তখন এটি ছিল দেনার দায়ে জর্জরিত ক্ষুদ্র টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার। এটি এখন মাল্টিন্যাশনাল জায়ান্ট। এর উল্লেখযোগ্য শেয়ার রয়েছে কোকাকোলা, গোল্ডম্যান স্যাকস, জনসন অ্যান্ড জনসন, ওয়াশিংটন পোস্টের মতো কোম্পানিতে। এর অধিভুক্ত কোম্পানিও শতাধিক। বাফেট মনে করেন, বার্কশায়ার ছোটই থাকত একটি বিষয় তার উপলব্ধিতে না এলে। সেটি হলো, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা চলবে না, রাখলে প্রতিষ্ঠান বড় হওয়ার সুযোগ পাবে না।

ব্যবসা বড় হলে এমনিতেই একা সবকিছু সামলানো কঠিন এবং তা বোকামিও। এমন চেষ্টায় যারা নিজেদের নিযুক্ত রাখেন, তাদের অবস্থা ওই লোকটির মতো, যিনি আকাশে ১০০টি বিভিন্ন রঙের টেনিস বল ছুড়ে দিয়ে সবই ধরতে চাইছেন। তার টার্গেট বেশি থাকায় ধরে রাখা যাচ্ছে না ফোকাস। শেষ পর্যন্ত কোনো বলই ধরতে পারছেন না তিনি। প্রতিটি ব্যবসারই নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা ধারা রয়েছে। এটি মুদি দোকানের ক্ষেত্রে এক রকম আর পেপসির মতো জায়ান্ট করপোরেশনের বেলায় ভিন্ন। দেখা যায়, যে ব্যবসায়িক কৌশল পেপসির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীনভাবে সফল, সেটি মুদি দোকানে প্রয়োগ করলে কিছুই মিলছে না— ব্যর্থতা

ছাড়া। কিছু কোম্পানি রয়েছে, যেগুলো পরিচালনা করতে লাগে বিশেষায়িত জ্ঞান। যেমন অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবহন ব্যবসা প্রভৃতি। কোনো চেয়ারম্যান যদি এসবে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকতে হবে। আর সেটি হতে হবে সিইও, ম্যানেজারদের চেয়ে বেশি। কথা হলো, কারও যদি একাধিক এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে? ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত রাবণের মতো ১০টি মাথা থাকলেও সেটি এ যুগে এ ক্ষেত্রে কাজে আসবে কি? ফলে বাফেট স্থির করেছেন, যে বিষয় খুব ভালো বুঝি না, তা একেবারেই বুঝতে চাই না। আমাকে সবকিছু বুঝতে হবে কেন? তাই অনেক বোর্ড চেয়ারম্যানের ৯৮ শতাংশ ক্ষমতাই নিজের হাতে রাখার যে 'স্বাভাবিক প্রবণতা' রয়েছে, তার বিপরীতে বাফেটের নীতি হলো, প্রতিষ্ঠানকে সিইও-ম্যানেজারের হাতে এমনভাবে ছেড়ে দিন, যাতে তারা অনুভব করেন চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন। সব দায়-দায়িত্ব এখন তাদের ঘাড়ে।

এর আগে কয়েকটি পূর্বশর্ত পালন করতে হবে। দেখতে হবে, যাকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, তার বুদ্ধি-বিবেচনা কেমন? ওই ব্যবসা সম্পর্কে কতটুকু জানেন? বিশেষ মানবিক গুণ থাকলেও বুদ্ধিহীন লোকের পক্ষে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। আরামপ্রিয়দের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না; প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েন এরা। আন্তরিকতা কম থাকা ব্যক্তিদের আবার উন্নতির চেষ্টা থাকে না খুব একটা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ম্যানেজারের সততা ও চারিত্রিক সংহতি। অসৎ সিইওর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই দেখা গেছে, এরা নিজ স্বার্থে তাদের সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের লাল বাতি জ্বালিয়ে ভেগে যাচ্ছেন। বাফেটের মতে, দৃষ্টি একটু প্রসারিত ও ধারালো হলে ম্যানেজার-সিইও হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এক ধরনের মানুষ আছেন, যাদের কাছে পেশা শুধু উপার্জনের মাধ্যম নয়, ব্যক্তিগত গর্বও বটে। পেশাগত সমস্যা-জটিলতায় আক্রান্ত হলে এরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার; অনুকূল সময়ে তাদের চেষ্টা থাকে উন্নতির। সর্বোচ্চ সুফল পেতে চাইলে এদের ওপর কাজ চাপানো চলবে না; দায়িত্ব দিতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকেন স্বাধীনচেতা। মানুষ কোনো ক্ষেত্রকে আপন ভাবতে শুরু করলে সেখানে কিছু স্বাধীনতা চায়-ই। খেয়াল রাখতে হবে এদিকে।

এ জীবনদর্শন অনুশীলন করেন বাফেট। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান চিরকুট পাঠাচ্ছেন এমডি-সিইওর কাছে— 'এটা করলেন না কেন' কিংবা 'ওটা করুন'। কিন্তু বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অধীন সব সিইওকে বলা আছে, এ ধরনের কোনো নোট তাদের কাছে যাবে না বাফেটের পক্ষ থেকে। বার্কশায়ারের অধীন ফরেস্ট রিভারের এমডি পিটার রিগল জানতে চেয়েছিলেন, কোম্পানির বার্ষিক মিটিংয়ে থাকবেন কি না চেয়ারম্যান (বাফেট)। উত্তর এল, বছরে একবারের বেশি দেখা হবে না। ম্যাকলেইন কোম্পানির সিইও গ্র্যাডি রোজিয়ারের একবার জরুরি হয়ে পড়ে কোম্পানির জন্য কয়েকটি নতুন জেটবিমান কেনা। বিপুল অর্থের দরকার ছিল তাতে। একা সিদ্ধান্ত নিতেও পারছিলেন না। বাফেটকে জানালেন, কী করবেন? তিনি জবাব দিলেন, আপনার প্রতিষ্ঠান। আপনিই বুঝবেন কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়।

গবেষণায় যাবেন না পরীক্ষিত কর্মী নিন

শেয়ারবাজারকে কখনই জুয়া ভাবেননি বাফেট। এটি ছিল তার শখ, ব্যবসা ও পেশা। তার একটি বিনিয়োগ কৌশল সম্ভবত সবারই জানা— শেয়ার কিনতেন দাম কমে গেলে। এ ধরনের কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য হতেন। তারপর দেখতেন, কী কারণে মুনাফা করতে পারছে না কোম্পানিটি। হেলে পড়া প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর চ্যালেঞ্জে তিনি আনন্দ পেতেন। সেটি লাভজনক হয়ে উঠলে হয় আরও শেয়ার কিনতেন, নয়তো দিতেন বেচে।

নেব্রাস্কার ডেম্পস্টার মিলস তৈরি করত বায়ুকল ও সেচযন্ত্র। খুচরা যন্ত্রাংশও বিক্রি হতো এখান থেকে। কোম্পানিটির প্রতি বাফেটের নজর ছিল আগে থেকেই। অপেক্ষাও করছিলেন— এর শেয়ারের দাম কবে পড়বে। সুযোগও এসে গেল। একবার ডেম্পস্টার মিলসের প্রতি শেয়ারের প্রকৃত দাম কমে গেল ২৫ শতাংশ। তার সিংহভাগ কিনে নিলেন বাফেট; হলেন এটির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে এত বড় হয়নি তখনো। তবে ছড়াতে শুরু করেছে বাফেটের খ্যাতি। এ অবস্থায় ডেম্পস্টারের পেছনে সময় দেয়ার সুযোগও ছিল খানিকটা। কিছুদিন পর তিনি বুঝতে পারলেন কোম্পানিটির অন্তর্নিহিত অর্থনীতিতে গোলমাল নেই; সমস্যা ম্যানেজারের দক্ষতায়। বাফেট বোর্ডে তুললেন কথাটা। বাকি সদস্যদের বিশ্বাস করালেন,

ম্যানেজার বদলালে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে। সর্বসম্মতিক্রমে নেয়া হলো নতুন ম্যানেজার। দেখা গেল, নতুনজন আগের ম্যানেজারের চেয়েও অদক্ষ। আগেরজন জ্বালিয়েছিলেন হলুদ বাতি; ইনি জ্বালাচ্ছেন কমলা। আবার ম্যানেজার খোঁজা শুরু হলো। এবার জ্বলল লাল বাতি। অনেকে আছেন, এমন পরিস্থিতিতে একে-ওকে ধরে ম্যানেজার হিসেবে কাজ চালানো যায় কি না, গবেষণা করেন। বাফেট তা পছন্দ করতেন না একেবারেই। সমস্যা হলো, তার পরিচিত ও দক্ষ ম্যানেজাররা তখন প্রায় সবাই নিযুক্ত বার্কশায়ারেরই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে। উপায় না দেখে বাফেট পরামর্শ চাইলেন দীর্ঘদিনের বন্ধু ও উপদেষ্টা চার্লি মানজারের কাছে। মানজার জানালেন, হ্যারি বটল নামে যোগ্য একজন আছেন তার খোঁজে। জটিলতা হলো, হ্যারি থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানকার ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া ছেড়ে নেব্রাস্কার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আসতে চাইবেন কি তিনি? বাফেট নিলেন হ্যারিকে পটানোর দায়িত্ব। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও এককালীন ৫০ হাজার ডলার বোনাসে অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যারি বটল ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন ডেম্পস্টার মিলসে। তিনি এসেই দেখলেন— মূল সমস্যা পণ্যের দাম নির্ধারণে। ডেম্পস্টার সবকিছুই বিক্রি করছে বাজার মূল্যে। এতে সুবিধা করতে পারছে না প্রতিযোগিতায়। অথচ ডেম্পস্টার এমন কিছু যন্ত্রাংশ বেচে, যা আর কারও কাছে নেই। আগ্রাসী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন হ্যারি। স্থির হলো, এখন থেকে যেসব পণ্য সবাই বিক্রি করে, তার দাম অর্ধেক নামিয়ে দেবে ডেম্পস্টার। আর যেগুলো ডেম্পস্টার ছাড়া অন্য কারও নেই, সেগুলো কিনতে দিতে হবে আগের চেয়ে তিন গুণ বেশি দাম। হ্যারির সিদ্ধান্তে এসব পণ্যে মনোপলি সুবিধা ভোগ করতে লাগল কোম্পানিটি। ডেম্পস্টার ঘুরে দাঁড়াতে লাগল।

বাফেট কাউকে কাজ দিতেন না সুস্পষ্ট ট্র্যাক রেকর্ড ছাড়া। হ্যারির ট্র্যাক রেকর্ড ছিল প্রবলেম সলভার (সমাধানকারী) হিসেবে। উন্নতি করতে থাকা প্রতিষ্ঠানে খুব একটা সুবিধা করতে পারতেন না তিনি। তবে সমস্যায় জর্জরিত কোম্পানিকে পারতেন লাভজনক করে তুলতে। এরপর বাফেট যখনই লোকসানে পড়া প্রতিষ্ঠান সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন, তখনই ডেকেছেন হ্যারি বটলকে। 'হ্যারি ওষুধ' ব্যর্থ হয়নি এ পর্যন্ত।

ঠেকে ও ঠকে জীবনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করেছিলেন বাফেট। এর অন্যতম হলো, মুমূর্ষু অবস্থা না হলে ম্যানেজার না বদলানো। এক বন্ধুকে তিনি রসিকতাচ্ছলে বলেছিলেন, ম্যানেজার আর স্ত্রী বদলানো একই ব্যাপার। যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলো, অমুকের সঙ্গে ঘর করবে না— প্রথমত, এটি খুব বেদনাদায়ক। দ্বিতীয়ত, সম্পর্ক ছিন্ন ও নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যয় হবে অনেকটা সময়। তৃতীয়ত, তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারবে না, দ্বিতীয়জন প্রথম স্ত্রীর চেয়ে ভালো হবে। এমন ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তা শুধরানো কঠিন। ফলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে ম্যানেজার পদে এমন কাউকে বসাতে, যার ট্র্যাক রেকর্ড প্রমাণিত। তার আগে অবশ্য নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, পরিবর্তন আনাটা কি অনিবার্য? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে প্রথমে দেখুন— ওই প্রতিষ্ঠানেরই কাউকে দায়িত্বটি দেয়া যায় কি না। এ জন্য বাফেট সবসময় জোর দেন প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলায়। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সিইওদের কাছে কোম্পানির প্যাডে চেয়ারম্যান (বাফেট) স্বাক্ষরিত একটি চিঠি আসে প্রতি বছরই। তাতে লেখা থাকে, আজ মারা গেলে কাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের কে আপনার পদে যোগ দিতে পারবেন? নাম লিখে পাঠান। বার্কশায়ারের কোনো কোম্পানি এক দিনও এতিম থাকতে পারবে না। বাফেটের মতে, কোম্পানির ভেতর থেকেই ম্যানেজার খুঁজে বের করা ভালো। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সহজ হয় তাতে। ওই নির্দিষ্ট কোম্পানির পণ্য ও সেবা সম্পর্কে তার বিস্তারিত ধারণাও থাকে আগে থেকে। তিনিই তো জানেন, তার পণ্য বা সেবার গ্রাহক কারা আর তারা কী চায়?

ভাগ্যের শিকার না ভাগ্যশিকারি?

সাফল্যের পূর্বশর্ত কী? কেউ কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারেন না কেন? কোন কৌশলে ধনী হন মানুষ? প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তিরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা কোনটি? চরম প্রতিকূলতার মাঝেও ঘুরে দাঁড়ান কোনো কোনো নেতা। টেনে তোলেন জাতিকে। নিয়ে যান উন্নতির শিখরেও। কোন ক্ষমতাবলে?

কৌশলটি ওয়ারেন বাফেট শিখেছিলেন তার বাবা হাওয়ার্ড বাফেটের কাছে। ভদ্রলোক ছিলেন একটু ক্ষ্যাপাটে। ভাগ্যে বিশ্বাস করতেন না একেবারেই। বলতেন, মানুষ নিজে তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। ত্রিশের দশকে 'গ্রেট ডিপ্রেশন' দেখা দিল ইউরোপ-আমেরিকায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল জনগণ। লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে ঘুরতে থাকল আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায়। গুজব ছড়াতে লাগল— এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই; মন্দায় ব্যবসা-বাণিজ্য সব শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরলেন হাওয়ার্ড। মন্দার মধ্যেও সফলভাবে ব্যবসা করা সম্ভব। নেমে পড়লেন এবং সফলও হলেন তিনি। এরই মধ্যে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে উপলব্ধি করলেন, অর্থনীতির গণ্ডগোলটা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে। এটি দূরীকরণে সরকারকে প্রভাবিত করতে হবে সরাসরি। কিন্তু তার উপায়? হাওয়ার্ড সিদ্ধান্ত নিলেন, জনপ্রতিনিধি হবেন। ১৯৪৩

সালে নেব্রাস্কা সেকেন্ড ডিস্ট্রিক্ট থেকে ইউএস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের নির্বাচিত সদস্য হলেন তিনি। ট্রুম্যান ডক্ট্রিনের (নীতি) কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি। তার বিশ্বাস ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট আর্থসামাজিক সংকটের অন্যতম কারণ বরং এটি। ফলে সুযোগ পেলেই ওই ডক্ট্রিনের তীব্র সমালোচনা করতেন কংগ্রেসের ভেতরেই। দুই বছর বাদ দিয়ে ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসে। প্রথমবার সম্মানী পান মাসিক ১০ হাজার ডলার। দ্বিতীয়বার পয়সাকড়ি তুলতে গিয়ে দেখেন, ১২ হাজার ৫০০ ডলার করা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী। হাওয়ার্ড ১০ হাজার ডলার তুললেন। বাকি অর্থ জমা দিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। নোট পাঠালেন কংগ্রেসে— প্রদত্ত 'সার্ভিসের' জন্য ১০ হাজার ডলারের বেশি সম্মানী প্রত্যাশা করেন না তিনি। পরিবার ভরণপোষণের জন্যও ১০ হাজারই যথেষ্ট; ১২ হাজার ৫০০ ডলারের প্রয়োজন নেই তার।

এই হাওয়ার্ড ছেলেকে উপদেশ দিতেন, ভাগ্য যেন তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে; উল্টো ভাগ্যকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। জীবনে উন্নতি করতে চাইলে সিদ্ধান্ত নেবে কারও দিকে না তাকিয়ে। শেয়ারে বিনিয়োগ করতে গিয়ে কথাটির মর্ম বুঝেছিলেন বাফেট। মাঝে মধ্যে বিনিয়োগকারীরা বলাবলি করতেন, অমুক কোম্পানি পড়তে শুরু করেছে, সুতরাং ওটার শেয়ার কেনা যাবে না। বাফেট সেটিই কিনতেন তখন। আবার ওয়াল স্ট্রিটে বিনিয়োগকারীরা যখন ফিসফাস করতেন— দাম বাড়ছে, আরও বাড়ুক, কয়েকটা দিন দেখি, তারপর বেচব; বাফেট তখনই বিক্রি করে দিতেন ওই কোম্পানির শেয়ার।

অভিজ্ঞতা থেকে বাফেট শিখেছেন, জনপ্রিয় ও প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে কিছু করাটা খুব কষ্টের। এতে হেরে গেলে নিজেকে ছাড়া কাউকে দায়ী করা যায় না; নানা ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয় একা। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো, বিফলতার অন্তর্জ্বালা দীর্ঘদিন বহন করতে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে। সারাক্ষণই তার মনে হতে থাকে— আরে, ওটা করতে গেলাম কেন; এটা করলেই তো হয়ে যেত। এমন পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করা বেশ কঠিন। দুটি আইরিশ ব্যাংকে বিনিয়োগ করে বড় বিপদে পড়েছিলেন বাফেট। ভুল হয়েছিল কনোকোফিলিপসে বিনিয়োগের সময়ও। তখন উপলব্ধি করেছিলেন ওই অন্তর্জ্বালা। এর বিপরীতে প্রচলিত মতের পক্ষে থাকার সুবিধা হলো, এ ক্ষেত্রে বলির পাঁঠার অভাব হয় না; নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো না কোনো কিছুকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায়ই।

জুলিয়ান রটারের বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো, লোকাস অব কন্ট্রোল থিওরি (নিয়ন্ত্রণ স্থান তত্ত্ব)। এটি বলে, দুই রকম মানুষ আছে বিশ্বে। এক, যারা ইন্টারনাল লোকাস অব কন্ট্রোল ক্ষমতাসম্পন্ন। তুলনায় এদের সংখ্যা কম। এ ক্যাটাগরির ব্যক্তিরা পরীক্ষায় খারাপ করলে বলেন, প্রস্তুতি ভালো ছিল না। ব্যবসায় মার খেলে দোষ দেন নিজের নেয়া কৌশলকে। দ্বিতীয় টাইপের মানুষের (এদের সংখ্যাই বেশি) থাকে এক্সটার্নাল লোকাস অব কন্ট্রোল। এরা পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে প্রার্থনা করেন, প্রশ্ন যেন সহজ হয়; পরীক্ষকও যেন উদারভাবে খাতাটা দেখেন। এ ধরনের ব্যবসায়ীরা চান— সরকার অমুক নীতি নিক, নইলে ব্যবসা হবে কীভাবে? প্রথম টাইপের ব্যক্তিরা ব্যস্ত থাকেন নানা সমস্যার সমাধানে। আর দ্বিতীয়দের মন-মগজ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় ওজর-আপত্তি।

প্রশ্ন হলো, কারও যদি ইন্টারনাল লোকাস অব কন্ট্রোল না থাকে বা এটি অর্জনেও ব্যর্থ হয় কেউ? তিনি কি ভালো নেতা বা ম্যানেজার হতে পারবেন না? এর সোজাসাপ্টা উত্তর বাফেটের কাছে নেই। তবে একবার তিনি বলেছিলেন, দূর থেকে কিছু দম্পতির সম্পর্ক দেখলে মনে হয়— অচিরেই সংসারটা ভেঙে যাবে। অথচ বাস্তবে সুখীই তারা। আবার কিছু দম্পতির বাহ্যিক সুখ দেখে ঈর্ষান্বিত হন অন্যরা। ভাবেন, এদের মতো কে আর আছে? অথচ এ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রয়েছে গভীর ও অসমাধানযোগ্য জটিলতা। বাফেটের ইঙ্গিত বোধহয় কারও যদি ইন্টারনাল লোকাস অব কন্ট্রোল না থাকে, তার উচিত হবে দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করা।

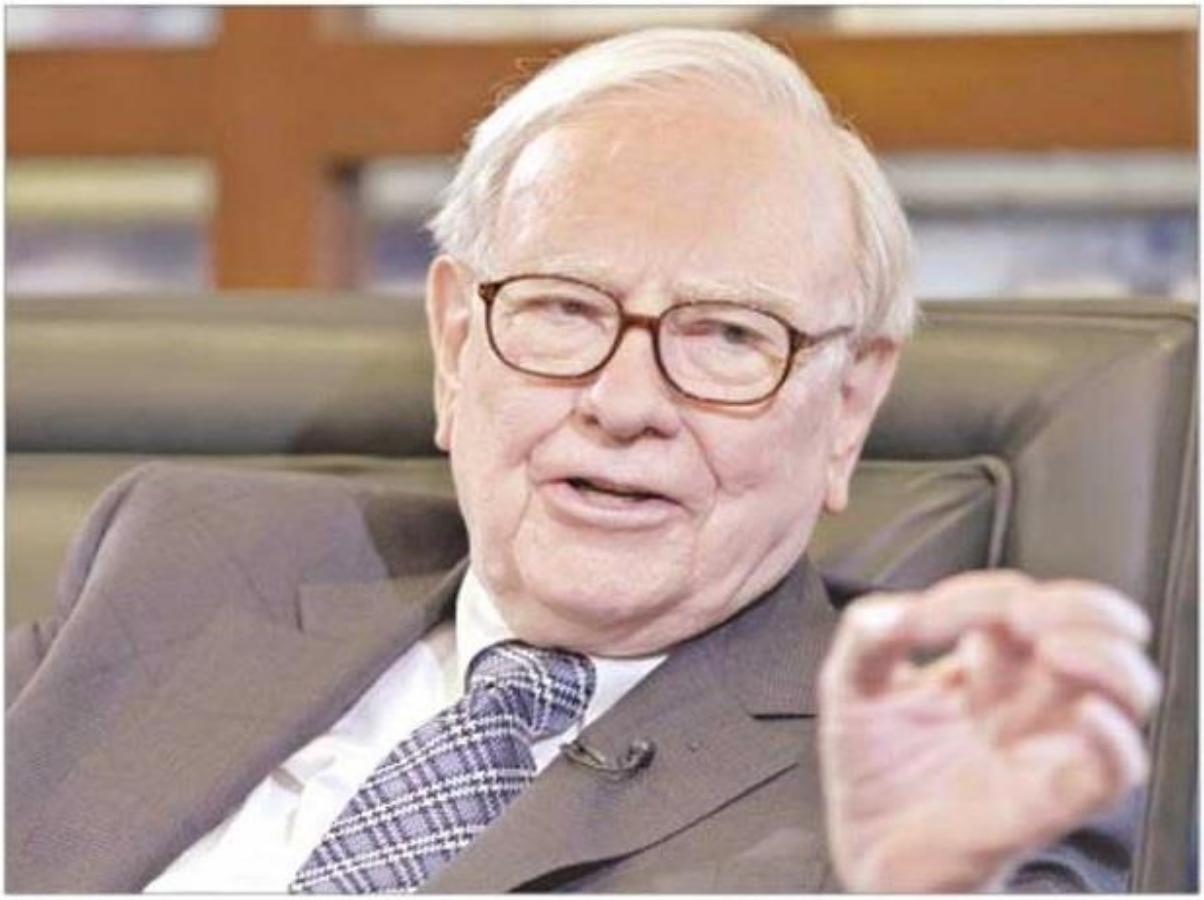

প্যাশন হোক পেশার চালিকাশক্তি

অনেককে গর্বের সঙ্গে বলতে শুনি, আমি পেশা আর প্যাশনকে (মানুষ যা করতে ভালোবাসে) এক করে দেখি না। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইন পেশায় নিযুক্ত রয়েছি আয়-উপার্জন নিশ্চিত করতে। এটি আমার পেশা; তবে ভালোবাসি গান গাইতে। কিন্তু এ দিয়ে তো আর পেট চলে না। প্যাশন ও পেশাকে এক করে দেখাও ঠিক নয়। পেশা সহজেই 'দূষিত' করে ফেলতে পারে প্যাশনকে।

বাফেট বিশ্বাস করেন এর সম্পূর্ণ বিপরীতটি। তার মতে, পেশা নির্বাচন করতে গিয়ে কেউ কেউ আত্মাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়; তেতো কাজটিই বেছে নেয় উপার্জনের উপায় হিসেবে। তারা এও জানে না, নিজের মতো করে জীবননির্বাহ করতে আসলে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন। কেউ কেউ আবার নামডাকওয়ালা পেশায় যুক্ত হতে চায় বায়োডাটার ওজন বাড়াতে। এমন ব্যক্তিরা বছরের পর বছর দৈনিক ৯-১০ ঘণ্টা করে মেধা-পরিশ্রম অপব্যয় করে পেশায়। স্বপ্ন দেখতে থাকে— আর কয়টা দিন? হাতে কিছু পয়সা-কড়ি জমুক। ছেড়েই দেব এ পেশা। এরপর মন যা চায়, তা-ই করব। কিন্তু সমস্যা হলো, 'হাতে যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকবে'— এমন দিন আর আসে না। শেষ বয়সে গিয়ে উপলব্ধি হয়, মূর্খের মতো নিজের জীবন নিজেই ধ্বংস করেছি আমি। আত্মাকে কষ্ট দেয়ায় এরা থাকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ; যার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মধ্যে ঘটতে দেখা যায় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের ওপর। কারও কারও অবশ্য আগে থেকে পরিকল্পনা থাকে না। এদের অনেকে যোগদানের পর কাজটি ভালোবাসতে শেখে। কেউ কেউ ভালোবাসার অভিনয়ও দেখায়। সেটি যা হোক, যারা অপছন্দনীয় কাজকে পেশা হিসেবে নেয়, তারা

আসলে ওই ব্যক্তির মতো— যারা তরুণ বয়সে মনে মনে চায় ঘোড়ায় চড়তে। চড়ে না 'কাজের সময়' নষ্ট হবে ভেবে। তার মনোবাঞ্ছা হলো, অবসর নেয়ার পর হাতে প্রচুর সময় থাকবে; তখন চড়ব। অবসরে যাওয়ার পর সে ঘোড়ায় চড়ে ঠিকই। কিন্তু চড়াটা উপভোগ করতে পারে না বয়সের কারণে।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয় শৈশব থেকে। বাবা-মা চান সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-আইনজীবী বানাতে। এটি হলো প্রথম প্রভাবক। 'অর্থবিত্ত' সম্পর্কে ধারণা জন্মানোর পর সন্তানরাও ছুটতে থাকে প্যাশনকে পাশে রেখে, কোথায় 'পয়সা-কড়ি' বেশি— সেদিকে। বলছি না, সবাই পয়সা কামানোর উদ্দেশেই এ ধরনের পেশা বেছে নেয়। অনেকেই এসব পেশায় আসে শুধু মনের তাগিদ থেকে। সেটি ব্যতিক্রম ও প্রশংসনীয়। অধিকাংশ মানুষ ঝলমলে পেশা বেছে নেয় অর্থের লোভে পড়ে।

বাফেট বিশ্বাস করেন, এভাবে আত্মার চাহিদা পায়ে দলে হয়রান হয়ে অর্থের পেছনে ছোটাটা জীবনের চরম অব্যবস্থাপনা। সাধারণত এ ধরনের মানুষ উন্নতির চূড়ায় পৌঁছতে পারে না। প্যাশন ও পেশাকে আলাদা রাখতে গিয়ে অনেক সময় পা হড়কে পড়ে যায় খাদেও। ব্যবসায় কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্য। এমন একজন অতিসফল ব্যবসায়ীকে দেখান তো, যার পেশাটা প্যাশন নয়? আসলে যে কাজের প্রতি ভালোবাসা নেই, তাতে সফল হওয়া কঠিন। আর বেশির ভাগ মানুষই বুঝে উঠতে পারে না, সফলতার চালিকাশক্তি কোনটি— অর্থবিত্ত, না কাজের প্রতি ভালোবাসা? বড় মিউজিশিয়ান বা খেলোয়াড়ের জীবনী পড়ুন— এটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সফল কম্পিউটার প্রোগ্রামার, সেলস এক্সিকিউটিভ, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, নার্স, পুলিশ, ডাক্তার, আইনজীবী, বাবুর্চি— সবার ক্ষেত্রেই এটি কমবেশি প্রযোজ্য। সবচেয়ে মজার হলো, প্যাশনকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়া ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঘাটতি না থাকলে সিংহভাগ ক্ষেত্রে এরা আর্থিকভাবে সফল হন অন্যদের চেয়ে।

এ তো গেল চাকরিপ্রার্থীর কথা। যখন চাকরিদাতা হবেন? কোন ধরনের ব্যক্তিদের নেবেন ম্যানেজার বা অন্যান্য পদে? বাফেট বলেন, খুঁজুন কারা তাদের প্যাশনকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। এমন ব্যক্তিরা কাজে গর্বানুভব করে। ফলে দায়িত্ব দেয়া হলে সেটি তারা পালন করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে। একসময় ওই ব্যক্তি হয়ে যায় ব্যবসারই চালিকাশক্তি। তাদের সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয় সহকর্মীরা। বাফেটের এত উচ্চতায় ওঠার পেছনে বড় শক্তি ছিল এটি। তার ব্যক্তিগত দর্শন হলো— লাইফ ম্যানেজমেন্টে মন যা চাইবে, সেটিকেই বেছে নাও পেশা হিসেবে। আর বিজনেস ম্যানেজমেন্টের বড় কৌশল হলো, এমন ব্যক্তিদেরই কোম্পানিতে যুক্ত করা।

মুখোমুখি নয়, বিক্রেতা থাকুক ক্রেতার পাশে

বাফেট বলতেন, যে জিনিস আমি নিজের জন্য কিনব না, তা অন্যকে কেনার উপদেশ দিই কীভাবে? ক্রেতার মুখোমুখি বসা উচিত নয় কখনোই। একজন সফল বিক্রেতা সবসময় থাকে ক্রেতার পাশে। ক্রেতা তাকে মেনেও নেয় এমন বন্ধু হিসেবে, কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা ক্রয়ে যে তাকে দেবে সুপরামর্শ। অভিজ্ঞতা থেকে বাফেট জেনেছিলেন, ভালো সেলস পারসন তারাই, যারা বিশ্বাস করে— তারা যে পণ্য বিক্রি করছে, সেটি মানসম্মত এবং এর দামও যৌক্তিক। এ ধরনের সেলস পারসন পাওয়ার উপায় কী? এক হতে পারে— মোটিভেশনাল ট্রেনিং দিয়ে বা বিক্রি বাড়ানোর কায়দা-কানুন রপ্ত করিয়ে। তবে এ থেকে দীর্ঘমেয়াদি সুফল মেলে না। সবচেয়ে ভালো হয় কাজের প্রতি ভালোবাসা ও বিক্রিযোগ্য পণ্যের প্রতি নিজ থেকে অনুরাগ জন্মেছে এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা গেলে।

কোনো পণ্যের ওপর সেলস পারসনের আস্থা জন্মালে এটি নিজের অজান্তেই সে ডাইভার্ট করে ক্রেতার কাছে। এতে তখনই গুণাগুণ ঠাহর করতে না পারলেও ক্রেতারা অনুভব করে— পণ্যটি ভালোই হবে। এ ধরনের সেলস পারসন চেনার উপায়? মোটামুটি নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে কৌতূহল দেখায় তারা। সে যে পণ্য বিক্রি করছে, সেটি কোথায় তৈরি হয়? কী দিয়ে তৈরি? বিপণন টিম কাজ করছে কীভাবে? কেমন যাচ্ছে বিজ্ঞাপন? প্রতিযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কী? কোত্থেকে কাঁচামাল আনে তারা? তাদের পণ্যের দাম কেমন? কী ধরনের বিপণন কৌশল তারা নিয়েছে? এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খায় ওই সব সেলস পারসনের মাথায়। ফলে বিক্রির আগেই সে নিজ থেকে জেনে নেয়, তার বিপণনকৃত পণ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার

কী। কথোপকথনে সে ক্রেতার চাহিদা বুঝে নেয় সহজেই। আর সুপরামর্শ দিয়ে ক্রেতাকেও বুঝিয়ে দেয় সেটি। এ ধরনের সেলস পারসনরা চেষ্টায় থাকে, যাতে প্রতিযোগীদের পেছনে না পড়ে যায় সে এবং তার পণ্য। ফলে বিপণন কৌশল খুব একটা শেখাতে হয় না তাদের। পরিস্থিতি বুঝে তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নতুন নতুন কায়দা। একজন ক্রেতা হিসেবে চিন্তা করুন তো— কেনার সময় বিক্রেতার কোন বিষয়টি আশ্বস্ত করে যে, পণ্যটি ভালো? নিঃসন্দেহে তাদের আত্মবিশ্বাস।

ম্যানেজার বা সিইও নিয়োগে প্রার্থীদের মধ্যে এ গুণটি রয়েছে কি না— অতশী কাচ দিয়ে খুঁজতেন বাফেট। যদি সন্দেহ করতেন কারও মধ্যে অতিরিক্ত অর্থলোভ রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রার্থিতা বাতিল। তিনি বলতেন, অর্থ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই; তবে কাজের মানুষের প্রথম অগ্রাধিকার হলো তার কাজ। তার পর্যবেক্ষণ— বড় কোনো অবিচার না হলে এবং কাজে স্বাধীনতা দেয়া হলে এ ধরনের মানুষ কেবল অর্থলোভে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন না সাধারণত। দেখা যায়, দীর্ঘকাল তারা কাটিয়ে দেন একই প্রতিষ্ঠানে। এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে বাফেটের আশপাশেই। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের একাধিক সিইও আছেন, যারা মাল্টি মিলিয়নিয়ার হয়েছেন অনেক আগে; বয়সও পেরিয়েছে সত্তর। তবু কাজ করে যেতে চান। সম্মানী না দিলে না দেবে— তারা পরোয়া করেন না। চাইলেই কিন্তু অবসরে শান্তির জীবন কাটাতে পারতেন। অথচ সকাল হলেই ছুটে আসেন অফিসে।

তাদের একজন বাফেলো নিউজের প্রকাশক স্ট্যানফোর্ড লিপসি (স্ট্যান লিপসি নামেই বেশি পরিচিত)। বাফেলো-নায়াগ্রা ফলস মেট্রোপলিটান এলাকায় পত্রিকাটি যে সপ্তাহের ছয় দিন ২ লাখ ও রোববারে (সাপ্তাহিক ছুটির দিন) ৩ লাখের মতো কপি বিক্রি হয়, তার অন্যতম কারণ স্ট্যানের নিরলস প্রচেষ্টা। নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্টের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস বির নাতি আর্ভ ব্লাম্পকিনের কথাও বলা যায়। দাদির গড়া এ প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করছেন কৈশোর থেকেই। দীর্ঘদিনে তার ব্যাংকেও জমেছে প্রচুর অর্থ। তা সত্ত্বেও এ ভদ্রলোকের কাজ সকালে ওঠেই মার্টে যাওয়া। কাউন্টারে একজনকে বসিয়ে রেখে ক্রেতা পর্যবেক্ষণ করা। বুঝতে চেষ্টা করা, নতুন কোন্ ডিজাইনের দিকে ঝুঁকছে মানুষ। মাঝে মধ্যে আড়ি পেতে শোনার চেষ্টা করা— পণ্যভেদে বিভিন্ন গ্রুপের ক্রেতা কেমন বাজেট রাখছে। তারপর রাতে নোট লেখা— কোন পণ্যসামগ্রীর দাম কেমন নির্ধারণ করা উচিত, নতুন মডেলের কিছু আনতে হবে কি না প্রভৃতি। কেউ কেউ বিরক্ত হলেও আর্ভ কিন্তু সপ্তাহের ছয় দিনই কাজ করে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সফল সেলস টিম গড়ার কৌশল সম্ভবত এটিই— কাজ ও পণ্যের প্রতি অনুরক্তদের নিয়োগ দাও। এমন গুণ না থাকলে সেলস পারসন যত বুদ্ধিমানই হোক আর যত কৌশলই নিক না কেন, পণ্যের বিক্রি আটকে যাবে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে।

উৎকর্ষের মূলেই আবিষ্টতা

বাফেটের প্রতিবেশী ছিলেন এক দর্জি। কাজে অবসেশন (আবিষ্টতা) ছিল তার। শার্ট-প্যান্ট নিখুঁতভাবে না বানাতে পারলে শান্তি পেতেন না। ওমাহায় তার নামডাকও ছিল। কাজের মান না আবার খারাপ হয়ে যায়, এ আশঙ্কায় বেশি অর্ডার নিতেন না তিনি। ফলে খ্যাতি ছড়ালেও ভদ্রলোকের উপার্জন ছিল না তেমন। ছিলেন ক্যাথলিক ও ধর্মপরায়ণ। মনোবাঞ্ছা ছিল, জীবনে একবার হলেও নিজের পয়সায় ভ্যাটিকান যাবেন, দেখা করবেন পোপের সঙ্গে। এ ইচ্ছায় অর্থ সঞ্চয় পর্ব শুরু হয়ে গেল। অর্ডার বাড়ালেন না ভদ্রলোক। কমিয়ে দিলেন সংসারের খরচ। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে ঘুরেও এলেন ভ্যাটিকান থেকে। ফেরার পর প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্থানীয় গির্জার ফাদারও চলে এলেন বাড়িতে। তারা ফার্স্টহ্যান্ড বর্ণনা শুনতে চান— পোপ লোকটি আসলে কেমন? এ প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দর্জি নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, ৪৪ সাইজ মিডিয়াম (এটি বাংলাদেশের মানদণ্ডের তুলনায় ভিন্ন)। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সিইওদের বাফেট এ গল্পটা বলতেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে— একজন মানুষ তার কাজে কতটা অবসেশড হতে পারে।

বাফেট বলতেন, প্রকৃত ম্যানেজার হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ঘুম থেকে উঠেই ব্যবসার হিসাব মেলাতে শুরু করেন আর ঘুমাতে যান ব্যবসা

বাড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে। তিনি মাঝে মধ্যেই বলেন, অবসেশন ইজ দ্য প্রাইস ফর পারফেকশন (উৎকর্ষের মূলেই আবিষ্টতা)। বাফেটের নিজের অবসেশনের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ৬০ পেরোনোর পরও তিনি মুখস্থ করেছিলেন অত্যন্ত দুর্বোধ্য মুডিস (রেটিং কোম্পানি) স্টক ম্যানুয়ালের আগাগোড়া। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানুয়াল তার আগেই ঠোঁটস্থ। নিজের এ ধরনের অবসেশন সৃষ্টির জন্য বাফেট 'দায়ী' করেন ছোটবেলায় ওমাহার আরেক ভদ্রলোককে। শিক্ষা-দীক্ষা খুব একটা এগোয়নি বলে তাকে ছোট চাকরি করতে হতো পানি সরবরাহকারী এক কোম্পানিতে। স্বপ্ন ছিল নিজের একই ধরনের একটি কোম্পানি গড়ার। কীভাবে যেন তার সঙ্গে স্কুলে পড়াকালে বন্ধুত্ব হয় বাফেটের। মজা পেয়েছিলেন বলেই হয়তো বাফেট মিশেছিলেন তার সঙ্গে। যা হোক, ওমাহার মানুষজন কুলি করা, হাত ধোয়া থেকে শুরু করে সুইমিং পুলে সাঁতার পর্যন্ত কী পরিমাণ পানি ব্যবহার করে রোজ, সে হিসাব ছিল তার নখদর্পণে। সকালে দেখা হলেই তিনি কিশোর বাফেটকে তথ্য দিতেন, আজ ভোর ৫টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ওমাহার মানুষ ব্যবহার করেছে এত লিটার পানি; ব্যবসা করতে পারলে তার আর্থিক মূল্যমান হতো এত হাজার ডলার! ক্ষতিকর অবসেশন মানুষকে শেষ করে দিতে পারে। তবে কাজের বিষয়ে অবসেশন তাকে টেনে তোলে ওপরে। বাফেট নিজেই তার সাক্ষী। ওই ভদ্রলোক পরে ঠিকই একটা পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান খুলে বসেন এবং মিলিয়নেয়ার বনে যান। বার্কশায়ারে একটি বিষয় চালু করতে চেয়েছিলেন বাফেট। পারেননি বোর্ডের আপত্তিতে। সেটি হলো, চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ বোর্ডে কেবল একটি প্রশ্ন করা হবে, তারা বিশেষ কোনো কাজের প্রতি অবসেশড কি না?

ভালো ম্যানেজারের কথা উঠলেই বাফেট তুলে ধরতেন নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্টের প্রতিষ্ঠাতা রোজ ব্লাম্পকিনের দৃষ্টান্ত। তিনি বেশি পরিচিত মিসেস বি নামে। রাশিয়া থেকে আসা অভিবাসী রোজ ফার্নিচার ব্যবসা শুরু করেন ৫০০ ডলার ধার (হবু স্বামীর কাছ থেকে) করে; শহরের এক কোনায়, ছোট্ট দোকান নিয়ে। এখন নেব্রাস্কায় প্রায় ৭৭ একরের বেশি স্থানজুড়ে (সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বড়) আউটলেট তার। ক্ষুদ্রাবস্থা থেকে এটি এত বড় হতে পেরেছে মিসেস বির অবসেশনের কারণে। বাড়ি ফিরেও দোকানের হিসাবপত্র মেলাতেন ভদ্রমহিলা। ব্যবসায় সক্রিয় ছিলেন ৬০ বছরেরও বেশি (১০৪ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত)। জীবনে ছুটি নিয়েছিলেন মাত্র একবার। তবে ছুটি পুরো না কাটিয়েই ফিরে আসেন, ক্রেতার সমস্যা হচ্ছে ভেবে। মাঝে মধ্যে অবশ্য গাড়ি নিয়ে বেড়াতেন মিসেস বি। বেড়ানো বলা ঠিক হবে না। নেব্রাস্কায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কীভাবে ব্যবসা করছে।

বার্কশায়ারে এমন আছে আরও কয়েকজন। যেমন বীমা কোম্পানি গেইকোর (প্রতিষ্ঠানটির ওপর বাফেটের নজর ছিল ২০ বছর বয়স থেকে) সিইও টনি নাইসলি। তিনি এখানে কাজ করছেন ১৯৬১ সাল থেকে। কয়েকবার তাকে বলাও হয়েছে, বয়স হলো না! আর কত? অথচ তিনি নাছোড়বান্দা, অফিসে আসবেনই। আরেকজন ফ্লাইটসেফটির চেয়ারম্যান অ্যালবার্ট লি ইউয়েলশি (তাকে আধুনিক বিমান চালনা প্রশিক্ষণের জনক বলা হয়)। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৫১ সাল থেকে চালাচ্ছিলেন কোম্পানিটি। অনেক অনুরোধের পর ২০০৩ সালে মনে হয়েছিল, তিনি অবসর নিতে যাচ্ছেন। কিসের কী? ওই সময় ঘোষণা দিলেন, তিনি চেয়ারম্যান হতে চান। এটিই তার অবসর।

প্রচলিত অর্থে নিজেকে স্মার্ট ভাবেন না বাফেট। তার কাছে স্মার্টনেসের সংজ্ঞা অবশ্য ভিন্ন। তিনি মনে করেন, কাজের প্রতি অবসেশন ব্যক্তিকে স্মার্ট করে তোলে। কেউ কেউ চাকরিপ্রার্থীকে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করেন, অমুক পদ পেলে আপনি কোম্পানির মুনাফা কতটা বাড়াতে পারবেন বলে মনে করেন? প্রার্থীরা কখনো কখনো নিজ থেকেই বলে, যোগ দিলে অমুক করব, তমুক করে দেখাব। বাফেট বলেন, এসব মানুষ বোর্ডকে শুরুতে কোম্পানির লাভের গল্প শোনায়, পরে তলে তলে নিজের আখের গোছাতে থাকে। বার্কশায়ারে এদের নেয়া চলবে না। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে মাঝে মধ্যে উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেন বাফেট নিজে। সে এক মজার কাণ্ড! প্রার্থীদের ব্যবসাসংক্রান্ত প্রায় কিছুই জিজ্ঞেস করেন না তিনি। কোত্থেকে কী বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছে, সে সার্টিফিকেটও দেখতে চান না। তিনি গল্প করেন। জানতে চান, প্রার্থীর শৈশব-কৈশোর কীভাবে কেটেছে, কী কী ভালো লাগত, মজার অভিজ্ঞতা প্রভৃতি। এর মধ্য দিয়েই তিনি স্থির করেন প্রার্থীকে চাকরি দেয়া যায় কি না। বাফেটের যুক্তি হলো, কাউকে যদি সাইকেল ব্যবসার দায়িত্ব দিতে চান, তিনি হার্ভার্ড না এমআইটি থেকে অ্যারোডায়নামিকসে পিএইচডি নিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রার্থী শৈশবে সাইকেল চালাতে পছন্দ করতেন কি না, সাইকেল বিষয়ে তার অবসেশন রয়েছে কি না, সেগুলো জানা।

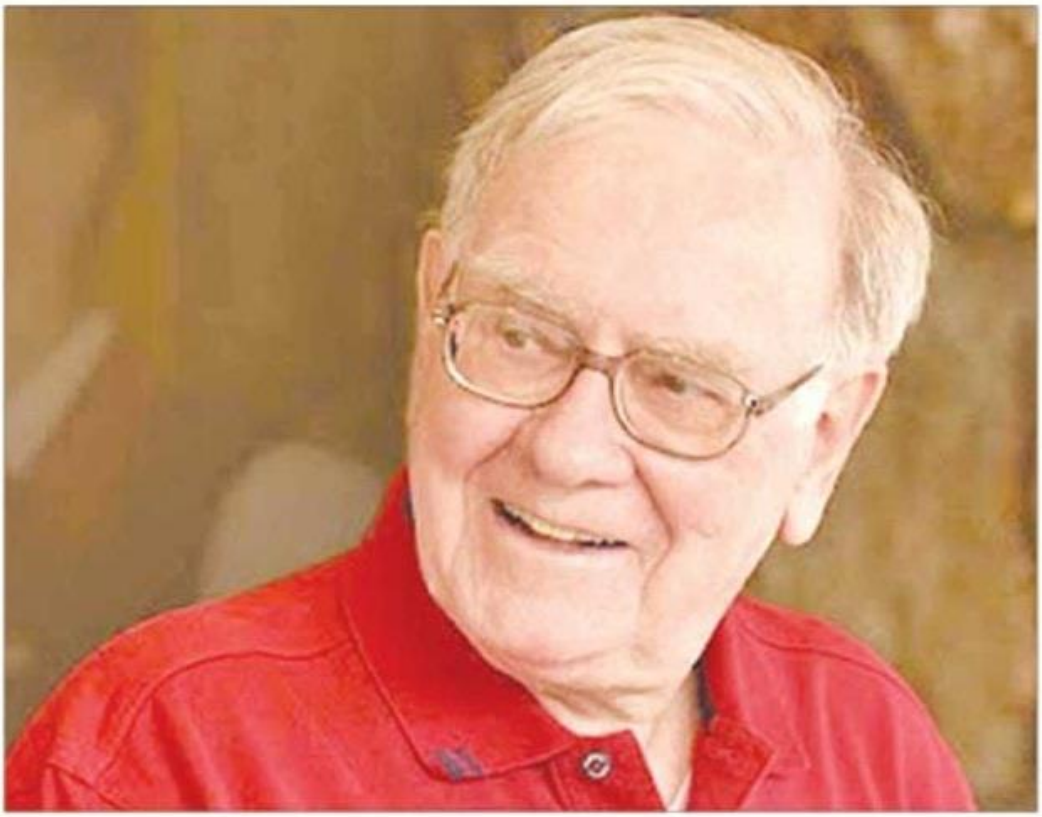

কপটতা ব্যবসার জন্য আত্মঘাতী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই নিজ দেশে নাম করছিল জার্মানির এক ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। ক্রেতার আস্থার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাও বাড়ছিল দ্রুত। লোকে নিশ্চিন্তমনে কিনতেন তাদের তৈরি ওষুধ। এদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে জার্মানি ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্যান্য অংশে। বাজারে তার ধারেকাছেও ছিল না প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে মুনাফা আরও বাড়িয়ে তোলার প্রলোভন প্রতিষ্ঠানটিকে মাতিয়ে তুলল নিত্যনতুন ওষুধ বাজারে ছাড়তে। এমনটিও ঘটল, কয়েকটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গোপন রেখেই ওষুধ ছাড়া হলো বাজারে। প্রতিদিন ব্যবহারকারীদের হাজারো অভিযোগ আসতে লাগল এতে। তখনো তাদের বিক্রি কিন্তু কমছিল না। তবে চরম সর্বনাশ ডেকে আনল কোম্পানিটির এমডির কপটতা। উচিত ছিল, নিজেদের ভুল স্বীকার করে বিবৃতি দেয়া; ওষুধটি বাজার থেকে তুলে নেয়া। তা না করে তিনি সংবাদপত্রে নোটিস পাঠাতে লাগলেন, তাদের কোম্পানির তৈরি ওষুধে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে গুজব রটাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীরা। তাদের সুনামহানির চেষ্টা চলছে। ক্রেতারা যেন এতে কান না দেন প্রভৃতি। এটিই চলল কিছু দিন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এমডি আদালতের শরণাপন্ন হলেন। প্রমাণ করতে চাইলেন, তাদের তৈরি ওষুধ নিরাপদ। শোনা যায়, কয়েক টন ঘি (ঘুষ) ঢালার পর নিম্ন আদালত থেকে রায় বের হলো প্রতিষ্ঠানটির পক্ষেই। সমস্যা হলো, সব দেশের ক্রেতারই একটি কমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যে কারণেই হোক, কারও সেবা বা কোনো পণ্যের প্রতি ক্রেতার অনাস্থা তৈরি হলে তারা নির্দ্বিধায় সেটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ক্রেতারা সিদ্ধান্ত নেন অন্যের দেখাদেখি বা আরেকজনের কাছে শুনে। জার্মান ওই ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি শেষমেশ দেউলিয়া হয়ে পড়ে স্রেফ একটি কারণে। সেটি হলো এমডির কপটতা।

প্রবাদই রয়েছে, ফাঁকি দিয়ে মহৎ কাজ হয় না; বড়ও হওয়া যায় না। বাফেটের পর্যবেক্ষণ হলো, যখন কোনো ম্যানেজার বা কর্মচারী নিজের ভুলগুলো অকপটে স্বীকার করেন, এ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা নেন, সে তখন দীর্ঘমেয়াদে তার সুফল পায়। কেন এমনটি হবে? আপাদমস্তক নির্লজ্জ না হলে

যে কাউকে বিব্রত করে তুলবে তার নিজের করা ভুল। এ ক্ষেত্রে মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো, কোথায় ভুল হয়েছে, সেটি খুঁজে বের করা ও তা শুধরানো। কারণ সে চায় না একই কারণে আরেকবার নিজের কাছে ও অন্যদের সামনে বিব্রত হতে। যারা নিজে জানার পরও ভুল অস্বীকার করে বা অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটে? একাধিকবার বলার পর একটা সময় মিথ্যাকে নিজেরাই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে তারা। দশ চক্রে পড়ে ভগবানও হয়ে ওঠে ভূত। এতে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যদি আমি না করে থাকি, তাহলে ভুলটা করল কে? সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে এ ব্যক্তিটি তখন খুঁজতে থাকে বলির পাঁঠা, যার ওপর অনায়াসে দোষ চাপানো যায়। জটিলতা সৃষ্টি হয়— কারও ওপর অন্যায়ভাবে ভুল চাপানোর পরও যদি প্রতিবাদ না ওঠে। সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে যিনি ভুলটি করেছেন, তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়— নিঃসন্দেহে ভুলটি আমার দ্বারা হয়নি। এভাবে কেউ যদি মাসে ১০টা ভুল করে ও সেটি বুঝেও তা অস্বীকার এবং শুধরানোর চেষ্টা না করে; কয়েক বছর পর দেখা যাবে, অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বিপদ ডেকে আনছে তার জন্য।

বাফেটের নীতি হলো, ভুল যত ক্ষুদ্র বা অগুরুত্বপূর্ণই হোক, বোঝামাত্র সেটি অকপটে স্বীকার করে নেয়া এবং শুধরানোর চেষ্টা চালানো। ব্যবসায় এটি জরুরি। সিইও, ম্যানেজার বা কর্মচারীরা যদি নিজেদের ভুল স্বীকার না করেন, সেটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এক সময় হয়ে ওঠে আত্মঘাতী।

কৃপণতা নয়, ব্যয় সচেতন হোন

ব্যবসার প্রাণশক্তি হলো মুনাফা। সেটি কমতে থাকলে রক্তস্বল্পতায় ভুগে একসময় শেষ হয়ে যেতে পারে ব্যবসা। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন 'গবেষণা' চালিয়ে জানা গেছে, মুনাফা অর্জনের পদ্ধতি রয়েছে মাত্র একটি। ক্রেতার হাতে পৌঁছা পর্যন্ত সামগ্রিক ব্যয়ের চেয়ে পণ্যটির দাম কম হলেই কেবল মুনাফা অর্জিত হয়। ব্যয় ও আয়ের এ পার্থক্যকে বলে 'প্রফিট মার্জিন'। অর্থকড়ি বানানোর অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। নেই বড়লোক হওয়ার ভিন্ন কোনো সমীকরণও। সহজ হিসাব— মুনাফা অর্জনে সক্ষম না হলে ব্যবসা টিকবে না বেশি দিন। আর কারও যদি মুনাফা বাড়তেই থাকে, স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যবসা বাড়বে; জীবনে আসবে সচ্ছলতা; মুনাফার হার ধরে রাখতে বা বাড়াতে পারলে হওয়া যাবে ধনী।

মুনাফা বাড়ানোর উপায় কী? দুটি পথ রয়েছে এর। প্রথম উপায়, সেলস টিমকে মোটিভেট করা, যাতে তারা বেশি বেশি পণ্য (ক্রেতার সাধ্যানুযায়ী) যথাসম্ভব বেশি দামে বিক্রিতে মনোযোগী হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি, উৎপাদন-বিপণনসহ সার্বিকভাবে ব্যয় কমানো; যথাসম্ভব কম দামে পণ্য ছাড়া। এ ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ও বায়িং টিমকে। অনেক সময় দেখা যায়, দুটির একটিতে দেয়া হচ্ছে জোর; এক রকম অগ্রাহ্যই করা হচ্ছে অন্যটিকে। অথচ প্রফিট মার্জিন বাড়াতে এ দুইয়ে সমন্বয় থাকাটা জরুরি। উৎপাদন-পরিচালন-বিপণন ব্যয় কমাতে হবে। আবার ক্রেতার কাছ থেকে নিতে হবে যতটা সম্ভব বেশি দাম। বাফেটের মতে, এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যয় কমানো। দাম কম রাখা গেলে এমনিতেই

ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পণ্য। এ ক্ষেত্রে মানে কিছুটা ছাড় দিতেও দেখা যায় ক্রেতাদের। সে জন্য একজন ভালো ম্যানেজার সবসময় চেষ্টা করেন ব্যয় সর্বনিম্ন রাখতে।

সমস্যা হলো, অধিকাংশ ম্যানেজার 'ব্যয় সর্বনিম্ন রাখা' বলতে বোঝায় কর্মী ছাঁটাইকে। আর এমন সিদ্ধান্ত তারা নেয় মন্দায় পড়লে। অথচ সুসময়ে এরাই একের পর এক আউটলেট খোলে; নিয়োগ দেয় অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় কর্মী। ব্যবসা ভালো চললে অনেক ম্যানেজারকেই দৃষ্টি দিতে দেখা যায় অফিসের সৌন্দর্যবর্ধনে। আবার এরাই বাজারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হলে এমন কিছু পদক্ষেপ নেয়, যা থেকে ক্রেতাদের ভাবোদয় হয়— অমুক কোম্পানি গাড্ডায় পড়েছে; তাদের পণ্য কেনা যাবে না।

এমন পরিস্থিতি এড়াতে বাফেটের পরামর্শ, সুসময়ে কৃচ্ছ সাধন ও দুঃসময়ে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা। কার্পণ্য অপছন্দ করেন তিনি। বলেন, কঞ্জুসরা এক ধরনের বাতিকগ্রস্ত। এরা দায়িত্ব নিলে কোম্পানির টুঁটি চেপে ধরবে। আর যারা হাত খুলে খরচ করেন? বাফেটের ভাষায়, ব্যবসা বাড়ানোর চেয়ে ইন্টেরিয়র-এক্সটেরিয়র ডিজাইনেই তাদের মেধা-শ্রম ব্যয় হয় বেশি। ফলে তিনি ভালোবাসেন সেসব ম্যানেজারকে, যারা ব্যয়সচেতন। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ম্যানেজারদের মধ্যে গুণটি রয়েছে কি না, তা খুঁটিয়ে দেখেন বাফেট। পর্যবেক্ষণে যদি মনে হয় কারও নেই এটি, তাহলে বেতন-ভাতা পরিশোধপূর্বক বিদায় দেয়া হয় তাকে।

ব্যয় কমানোর বিষয়ে বাফেটের প্রিয় ব্যক্তি অ্যাসোসিয়েটেড কটন শপসের মালিক বেঞ্জামিন রোজনার। ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে কৃপণ না হলেও বেশ মিতব্যয়ী ছিলেন। সহকর্মীরা তাকে আড়ালে ডাকত 'কঞ্জুস বুড়ো' বলে। তবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার জীবনের সিংহভাগ 'দুশ্চিন্তা' ছিল— কীভাবে ব্যয় কমানো যায়। বেঞ্জামিনের একটি গল্প পরিচিতদের মধ্যে খুব চালু। তিনি কোম্পানির জন্য বিপুল পরিমাণ পেপার ন্যাপকিন কেনার অর্ডার দিয়েছিলেন একবার। সেগুলো আসার পর নির্দেশ দেয়া হলো, তিনিই আগে খুলবেন কার্টন। সন্ধ্যায় কাজ শেষ, ন্যাপকিন গণনা শুরু হলো। দেখা গেল, অর্ডারের চেয়ে ১০-২০টা কম রয়েছে ন্যাপকিন। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডারকারী প্রতিষ্ঠানে ফোন দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন বেঞ্জামিন। কথিত আছে, তিনি টয়লেট পেপার কিনেও ফিতা দিয়ে মাপতেন— বিক্রেতা ঠকাল কি না দেখতে।

ব্যয়সচেতন হিসেবে পরিচিতি ছিল ক্যাপিটাল সিটিজ কমিউনিকেশনসের সিইও টম মার্ফিরও। তিনি এত সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন যে, প্রতিষ্ঠানের বাইরের কারও কল্পনায়ও আসত না— লোকটির এত বড় ব্যবসা রয়েছে। টমের শখ ছিল মিডিয়া হাউস কেনার। একসময় এবিসি টেলিভিশন নেটওয়ার্কও কিনে নেন তিনি। কেনার পর দেখা গেল, অফিসের দেয়াল রঙ করতে হবে। তিনি নির্দেশ দিলেন, পেছনের দেয়াল রঙ করার দরকার নেই। ব্যয় কমাতে এবিসিতে লিগ্যাল অ্যাডভাইজার রাখতেন না টম। প্রয়োজন হলেই কেবল শরণাপন্ন হতেন কোনো লিগ্যাল ফার্মের। এবিসিতে এক বিশাল ডাইনিং রুম ছিল— কেবল পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য। টেবিলটি বিক্রি করে দিয়ে তিনি ঘোষণা দেন, সবাই একসঙ্গে খাবে।

ব্যয় সচেতনতায় কম যান না বাফেটও। লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা ভক্সওয়াগন বিটল তিনি চালিয়েছেন মাল্টিমিলিয়নেয়ার হওয়ার পরও। বাধ্য না হলে পাঁচ তারকা হোটেলের রেস্টুরেন্টে যেতেন না। তার পছন্দের রেস্টুরেন্ট ছিল ওমাহার পথের ধারে গড়ে ওঠা সাধারণ হোটেলগুলো। বাফেটের যুক্তি হলো, তার জীবনবোধ চাকচিক্য সাপোর্ট করে না। বিলাসব্যসন ব্যবসার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণও কিছু নয়। সবচেয়ে বড় কথা, অর্থ যদি অপচয়েরই শিকার হয়, তাহলে সঞ্চয় তথা বিনিয়োগ বাড়বে কীভাবে?

স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যে উৎসাহী হবেন না

একই সঙ্গে বিনিয়োগকারী ও ম্যানেজার হওয়ার বিশেষ সুবিধা রয়েছে। বিনিয়োগে যেসব ভুল হতে পারে, এ ক্ষেত্রে তা আন্দাজ করা যায় ম্যানেজমেন্ট সেন্স দিয়ে। বাফেট বিশ্বাস করতেন, বিনিয়োগে সফলতার বড় কারণ ম্যানেজমেন্ট সেন্স। এটি বাড়িয়ে তুলতে স্বচ্ছভাবে দেখা ও দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অর্জন অপরিহার্য।

কারও বোধকরি অজানা নেই, বাফেট দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী। শেয়ার কিনে এক-দুই বছরের মধ্যেই বিক্রি করেছেন, তার ক্ষেত্রে এমন রেকর্ড খুঁজে পাওয়া ভার। ১০-১২ বছর পর কোম্পানি লাভজনক হলে তবেই কেনা শেয়ার বিক্রি করা তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা। এমনও হয়েছে, সেই ৩০-৪০ বছর আগে কিনেছিলেন, এখনো সে শেয়ার বেচেননি। এটি বাফেটের খেয়াল-খুশি ভাবাটা মোটেও ঠিক নয়। এর সবই তার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। তার নিজের ভাষায়, ওমাহার ওয়ারেন বাফেট যে আজ বিপুল ধন-সম্পত্তি গড়ে তুলতে পেরেছে, তার কারণ এ ভদ্রলোকের ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা।

বাফেটের পর্যবেক্ষণ, অধিকাংশ ম্যানেজারই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে বসে থাকতে পারে না অথবা পারলেও নিতে চায় না এ ধরনের পরিকল্পনা। এদের চিন্তাভাবনা তিন বা ছয় মাস কিংবা এক বছরের বেশি দূর যেতে পারে না। কারণ কী? প্রথমত, তারা শর্টরেঞ্জ প্র্যাকটিসে অভ্যস্ত। এ কারণে লংরেঞ্জ শুটিংয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই দৌড়ে পালায়। দ্বিতীয়ত, বাফেট আবিষ্কার করেছেন, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া বোনাস-

প্রমোশনের জন্য ভালো। ফলে বোর্ড মিটিংয়ে অনেক ম্যানেজার শোনায়, আগামী ৩-৬-১২ মাস অমুক পদক্ষেপ নেয়া হবে; তাতে কোম্পানির প্রাক্কলিত মুনাফা হলো এত। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে এসব স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েও মুনাফা করে ম্যানেজাররা। তৎক্ষণাৎ বোর্ডে দাবি তোলা হয়, তার পারফরম্যান্স বিচার করে কিছু সুবিধা বাড়ানো হোক। এ ধরনের দাবি তোলার জন্যই মূলত ম্যানেজারদের মধ্যে সাধারণ প্রবণতা রয়েছে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যে বেশি ফোকাস রাখার। সমস্যা হলো, এটি করতে গিয়ে তারা দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলে। কোনো কারণে বাজারে অস্থিরতা চলতে থাকার সময় যেসব ব্যবস্থা নিলে কোম্পানিটি হয়তো মুনাফা বাড়ানোরও সুযোগ পেত, সেদিকে খেয়াল থাকে না তাদের। এ কারণে বার্কশায়ারের সিইও-ম্যানেজারদের ওপর বাফেটের নির্দেশনা রয়েছে, তারা যেন স্বল্পমেয়াদি লাভ-লোকসান নিয়ে মাথা না ঘামান। তাদের টার্গেট যেন থাকে— দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে শক্তিশালী ও টেকসই করা যায়।

অভিজ্ঞতা বাফেটকে শিখিয়েছে, শর্টরেঞ্জ গুটিংয়ে অভ্যস্ত ম্যানেজারদের পুঁজি ব্যবস্থাপনাও ভালো হয় না সাধারণত। তাতে দেখা দেয় দুটি সমস্যা। প্রথমত, এরা গোঁয়ারের মতো ভুল ধারণা নিয়ে কোম্পানির 'গুড মানি' কাজে লাগায় মধ্যম মানের ব্যবসায়; যেটি মহাসমারোহে টাকা-পয়সা পানিতে ফেলার মতোই। দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদে বিপুল মুনাফার স্বপ্নে এরা থাকে আগ্রাসী। চিন্তা থাকে— দ্রুত পয়সা-কড়ি কামিয়েই সটকে পড়ব। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরা ঝুঁকিটা নেয় কোর বিজনেসের বাইরে গিয়ে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে বড় মার খায় এমন পরিকল্পনাকারী ম্যানেজাররা। এ ক্ষেত্রে বড় দৃষ্টান্ত হলো, বেভারেজ কোম্পানি কোকাকোলা। ষাট-সত্তর দশকের দিকে ব্যবসা তথা মুনাফা যখন হু হু করে বাড়ছিল, কোম্পানিটির তৎকালীন সিইও আগ্রাসী সিদ্ধান্ত নেন স্বল্পমেয়াদে ফিল্ম ব্যবসায় নামার। অথচ ভদ্রলোকের উচিত ছিল, হয় কোর বিজনেসের সঙ্গে মিল রেখে খাদ্য-পানীয় বা এ-জাতীয় ব্যবসা খোলা; নয়তো হলিউড নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা। সেসবের কোনোটাই না করায় তিনি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন যে, শেষমেশ তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ব্যাংকঋণ এনে। পরে কোকাকোলাকেই পরিশোধ করতে হয় সব দেনা।

আগেই বলা হয়েছে, কেনার সময় বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ছিল ব্যাপক লসের শিকার টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার। বাজারে টিকে থাকতেই হিমশিম খাচ্ছিল এটি। সে সময়ের ম্যানেজার রীতিমতো ঋণ নিয়ে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন কোম্পানিটি। বাফেট দায়িত্ব নেয়ার পর বুঝলেন, বার্কশায়ার টেক্সটাইল আসলে মুমূর্ষু, একে কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না; অপারেশন থিয়েটারে নিলেও নয়। এ মুহূর্তে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হবে, এর পেছনে ব্যয় আর না বাড়িয়ে 'রানিং ক্যাপিটাল' অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা। তিনি একে একে এর সব প্রোডাকশন ইউনিট বন্ধ করে দিলেন; সব পাওনা বুঝিয়ে বিদায় দিলেন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। আর এ থেকে যে অর্থ সাশ্রয় হলো, তা দিয়ে বাফেট কিনলেন একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। এটিই আজকের বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে। বিশ্বে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোয় যত অর্থকড়িই ঢালা হোক— ঘুরে দাঁড়াবে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান দয়ামায়া ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া; সাশ্রয়কৃত অর্থ অন্যত্র খাটানো। অবশ্য কোনো কোম্পানি সত্যি সত্যি এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে কি না, সেটি বুঝতে হলে ম্যানেজারদের মধ্যে থাকতে হবে দূর ও স্বচ্ছ দৃষ্টি।

ম্যানেজারদের বেতন-বোনাস নির্ধারণ কীসের ভিত্তিতে?

কিছু ব্যবসা আছে, যেগুলো খুবই প্রতিযোগিতামূলক। এগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থনীতি মধ্যম মানের। যেমন ফার্নিচার ব্যবসা। এমন ব্যবসাও রয়েছে, যেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থনীতি নিজে থেকেই চমৎকার। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির কথা বলা যেতে পারে এখানে। ঝুঁকি, দায় প্রভৃতি ইস্যু আমলে নিয়েও সিংহভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির সিইওর বেতন কোনো ব্র্যান্ড ফার্নিচার শপের ম্যানেজারের চেয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। রেটিং এজেন্সির সিইওরা মোটা বেতন-বোনাস পান; বছরে দুইবার হাওয়াই-মিয়ামি ঘুরতে যান কোম্পানির টাকায়। এদিকে ফার্নিচার শপ ম্যানেজারদের চাকরি সারা বছরই থাকে অনেকটা ঝুলে। যেকোনো মুহূর্তে চেয়ারম্যান চটে গেলেই চাকরি নট। এদের দিন কাটে অনিশ্চয়তায়; নিয়ত লড়তে হয় মুনাফা বাড়াতে। তার ওপর মন্দা দেখা দিলে তো কথাই নেই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের ওপর শারীরিক-মানসিক চাপ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। এসব সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বেতন-ভাতা পান না তারা। এর কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ যুক্তি দেখায়, অমুক ব্যবসার মুনাফা ভালো; তাই সিইওর বেতনও ভালো। আমাদের ম্যানেজার হয়তো প্রতিষ্ঠানের জন্য খেটে মরছে; তো কী হয়েছে? কোম্পানির মুনাফা তো বাড়ছে না। এ অবস্থায় তাকে কি 'ওই রকম' বেতন-বোনাস দেয়া যায়? এমন প্র্যাকটিস রয়েছে বিশ্বজুড়ে।

ওয়ারেন বাফেটের মতাদর্শ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ম্যানেজারের বেতন-বোনাস নির্ধারণ করা উচিত ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই; প্রতিষ্ঠানে তিনি কী ভ্যালু অ্যাড (মূল্য সংযোজন) করলেন, সেটি দেখে। চলতি বছর মুনাফা কেমন হলো, তা দেখে নয়। কারণ এমন অনেক ব্যবসা রয়েছে, যেগুলো বাজারে একচেটিয়া সুবিধা উপভোগ করে। এমন কোম্পানিতে অদক্ষ লোক ম্যানেজার হিসেবে বসলেও তা আগের মতোই চলবে বা মুনাফা সামান্য কম হবে। এখন প্রশ্ন হলো, যে ম্যানেজার প্রায় বসে থেকে মুনাফা অর্জন করছেন আর যাকে মুনাফা অর্জনে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে— এ দুজনের মধ্যে কার বেতন-বোনাস বেশি হওয়া উচিত? বাফেটের মতে, ওই ম্যানেজারই ন্যায়ত বেশি বেতন-বোনাসের দাবিদার, যিনি অন্তর্নিহিত অর্থনীতির কারণে মুনাফা বাড়াতে না পারলেও প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য বেশি শ্রম দিচ্ছেন। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সব প্রতিষ্ঠানেই এ নীতির অনুশীলন চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এ বিষয়টি যারা জানেন না, তাদের অনেকে বাফেটকে কাছে পেলে অনুযোগের সুরে বলেন— আপনার অমুক প্রতিষ্ঠান তো বিপুল মুনাফা করছে, অথচ তার সিইওকে বেতন-বোনাস দিচ্ছেন না সেভাবে। অথচ অমুক কোম্পানি লাভ করছে থেমে থেমে, তার ম্যানেজারকেই দিয়ে রেখেছেন রাজ্যের সুবিধা! বাফেট কিন্তু মনে করেন, ম্যানেজারদের বেতন-বোনাস নির্ধারণে তার নীতিটাই ন্যায়সঙ্গত। কেউ যদি চান প্রাতিষ্ঠানিকতা চালু করতে, টেকসই একটা ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে, তার জন্য এমন নীতি গ্রহণই জরুরি।

বার্কশায়ারভুক্ত এক কোম্পানির ইকুইটিপ্রতি আয় ছিল ২০ শতাংশ। বাফেট এ প্রতিষ্ঠানের সিইওর জন্য যে বেতন-বোনাস বরাদ্দ রেখেছিলেন, তা নিয়ে একবার তর্কই বেধে গেল সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে। বাফেটের বক্তব্য ছিল, ইনি কোম্পানিতে নতুন কী উন্নতি ঘটিয়েছেন? মুনাফা বাদে কোন বিষয়টিকে আমি তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বলে ধরে নেব? উনি যে পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছেন, সেটি তো আগের সিইওর সময়েও বজায় ছিল। এ ক্ষেত্রে আগেরজনের সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্যটা কোথায়? যদি পার্থক্য না-ই থাকে, তাহলে আমি ওনার বেতন-বোনাস আগেরজনের চেয়ে বেশি দেব কেন? এদিকে বাফেটেরই আরেক কোম্পানির ইকুইটিপ্রতি আয় ছিল ৫ শতাংশ। ব্যবসাটি ছিল প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক। ম্যানেজারকে সারাক্ষণই থাকতে হতো দৌড়ের ওপর। নিজ থেকে তিনি দায়িত্বের চেয়েও বেশি শ্রম দিতেন প্রতিষ্ঠানে। তার প্রায় সারাটা দিন কেটে যেত কোম্পানির আউটলেট, কাস্টমার সার্ভিসের ওপর নজরদারি করে এবং বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে। কীভাবে আরও ক্রেতা আকৃষ্ট করা যায়; বাজারে হঠাৎ মন্দা দেখা দিলেও কোন ব্যবস্থা নিলে প্রতিষ্ঠান তেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না— এসব ঠিক করতেন অবসরে। মুনাফা কম হলেও পণ্যের মান যাতে ঠিক থাকে, অভিযোগ বাক্সে একটি চিঠিও যেন না পড়ে, এসব দিকেও নজর ছিল তার। বাফেট এ ম্যানেজারকে যে বেতন-বোনাস দিতেন, তা অনেকেরই ঈর্ষার কারণ ছিল। বাফেট বলতেন, কোম্পানি যার দ্বারা লাভবান হচ্ছে, তাকে ভালোভাবে 'পে' করা কি কোম্পানির কর্তব্য নয়? তিনি বলতেন, একজন ভালো ম্যানেজার বড় ফুটবল কোচের মতো। এরা নিজে মাঠে না নেমেও দলকে খেলায় ও জিতিয়ে আনে। জয়ী হওয়ার উপাদান রেখে যায় টিমের মধ্যে, যাতে সে না থাকলেও জিততে পারে দলটি। সমস্যা হলো, ভালো কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না। খুঁজে বের করতে হয়। এর চেয়েও বড় সমস্যা, ভালো কোচের সংখ্যা খুব কম। সুতরাং ভালো ম্যানেজার পেলে ব্যবসা নয়— তার পারফরম্যান্সের ওপরই বেতন-বোনাস নির্ধারণ করা উচিত। সেটি করা দরকার এ জন্যও যে, এতে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার আগে তিনি চিন্তা করবেন কমপক্ষে দুবার।

বন্ধুসুলভ আচরণ কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে

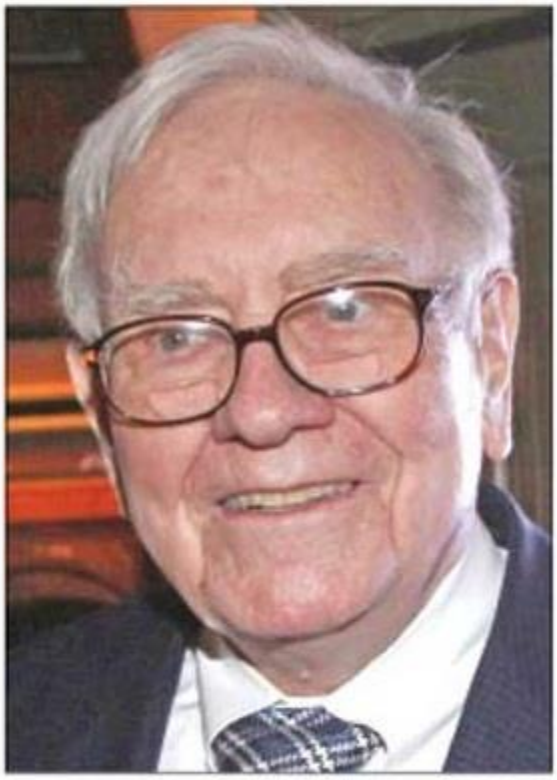

বেরিল রাফ বিএসবিএ (ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ডিগ্রি নেন বোস্টন ইউনিভার্সিটি এবং এমবিএ করেন ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটি থেকে। শিক্ষাজীবনে সিলেবাসের চেয়ে আড্ডায় মনোযোগ বেশি থাকায় সার্টিফিকেট তেমন ভারী হয়নি। অনেক খেটেখুটে তার চাকরি জোটে নিউজার্সিতে 'মেসি' নামে এক গৃহস্থালিসামগ্রীর দোকানে। তবে এখানে আসার পর এত দিন অনুদ্‌ঘাটিত নিজের স্বভাবসুলভ ম্যানেজেরিয়াল ট্যালেন্ট দেখে অবাকই হন বেরিল। তার অবদানে দ্রুত ব্যবসা বাড়ছিল মেসির। এর নতুন আউটলেট খোলা হলো ফার্নিচারসামগ্রীর। দায়িত্ব পেলেন বেরিল এবং এখানেও সফল হলেন। অবস্থাদৃষ্টে কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিল—গহনার ব্যবসায় নামবে। এরও দায়িত্ব নেবেন বেরিল। গহনার প্রতি তার আগ্রহ একেবারেই ছিল

না। বুঝতেনও না— কোন দাম, কী ডিজাইন ও মানের গহনা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করবে। ফলে মেসির জুয়েলারি শপে বেরিলের দায়িত্ব শুরু হলো অনেকটা অপ্রস্তুতভাবে। তবে সেটি কাটিয়ে উঠলেন দ্রুত। অনুভব করলেন— যতটা খারাপ ভেবেছিলেন জুয়েলারি বিজনেস, মোটেও তা নয়; বরং এটি সহজ ও আনন্দময় ব্যবসা। জুয়েলারিতেও সফল হতে লাগলেন তিনি। তার নাম ছড়াতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস ওয়ার্ল্ডে। এক পর্যায়ে অফার এল বিখ্যাত মার্কিন চেইন শপ জেসি পেনির পক্ষ থেকে— তার রিটেইল জুয়েলারি ডিভিশনের পরিচালক পদে যোগদানের। অনেক ভেবে তাতে যোগ দিলেন বেরিল।

এদিকে ওয়ারেন বাফেট তখন তার নতুন কেনা হেলজবার্গ ডায়মন্ড শপের জন্য একজন সিইও খুঁজছিলেন। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশাল এ কোম্পানিটি গড়ে তোলেন 'ডায়মন্ড কিং' খ্যাত বারনেট হেলজবার্গ। মাত্র ১৪ বছর বয়সে দায়িত্ব নিয়ে তিনি হেলজবার্গকে পরিণত করেন ২৪০টি আউটলেটের এক বিশাল চেইন শপে। তার মৃত্যু হলে চালাতে না পেরে প্রতিষ্ঠানটি বাফেটের কাছে বিক্রি করে দেন বারনেটের ছেলে। জুয়েলারি বিষয়ে বাফেটেরও জ্ঞান বেশি ছিল না। ফলে তিনি নির্ভরযোগ্য এমন একজনকে খুঁজছিলেন, যিনি কোম্পানিটি ভালোভাবে চালাতে ও লাভজনক করে তুলতে পারবেন। জুয়েলারিবিষয়ক বিভিন্ন ম্যাগাজিন ঘাঁটতে লাগলেন তিনি। সেখানেই জানলেন বেরিল রাফের বিষয়ে। মনে হলো, এ ভদ্রমহিলাই পারবেন হেলজবার্গ ডায়মন্ড শপ চালাতে। বার্কশায়ারের এক ম্যানেজারের মাধ্যমে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন— হেলজবার্গের পুরো দায়িত্ব নিতে আগ্রহী কি না বেরিল? সে ক্ষেত্রে তাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে। এ জন্য প্রথমেই তাকে আসতে হবে নেব্রাস্কায়। কয়েকটি কারণে রাজি হলেন বেরিল। জেসি পেনিতে তার কাজের স্বাধীনতা খুব একটা ছিল না। তার আগ্রহও ছিল বিলিয়নেয়ার ওয়ারেন বাফেটের সঙ্গে কাজ করার। যোগ্যদের কাছ থেকে ব্যবসার কলাকৌশল শেখার আগ্রহ তার সবসময়ই ছিল। তিনি ডালাস থেকে বিমানে চড়লেন নেব্রাস্কার উদ্দেশে। সেখানে বসে ভাবছিলেন, কীভাবে ইন্টারভিউ ফেস করবেন তিনি; কী কী বলবেন বাফেটকে প্রভৃতি। তবে এয়ারপোর্টে নেমে আগে খুঁজতে হবে ট্যাক্সি। কারণ নেব্রাস্কায় কখনো আসা হয়নি তার। বিমান থেকে নেমে অবশ্য হতভম্ব হলেন বেরিল। দেখলেন, তার নামাঙ্কিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাফেট নিজে। বেরিলের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। যাওয়ার পথে বাফেট ব্যবসায়িক কোনো আলোচনায়ই গেলেন না; শুধু জিজ্ঞেস করলেন— জার্নিতে কোনো রকম অসুবিধা বোধ করেছেন কি না! লাঞ্চের সময় বাফেট তাকে নিয়ে গেলেন কান্ট্রি ক্লাবে। সেখানে খেতে খেতে হালকা আলোচনা হলো— দিনকাল কেমন চলছে প্রভৃতি বিষয়ে। আর সেখানে কথা বললেন বেরিলই বেশি, বাফেট নিলেন আগ্রহী শ্রোতার ভূমিকা। লাঞ্চশেষে বাফেট ওমাহা শহর ঘুরিয়ে দেখালেন তাকে। সেখানে দুদিন ছিলেন বেরিল। এ সময়ে হেলজবার্গ ডায়মন্ড শপ প্রসঙ্গ একবারও ওঠেনি। শেষে বিদায় জানানোর সময় বাফেট বললেন, বেরিল যেন বার্কশায়ারের প্রস্তাবটি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ও সব দিক বিবেচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেন। কয়েক দিনে বাফেট ও বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েকে দেখে বেরিল এতটাই মুগ্ধ হন যে, তার ধারণা জন্মেছিল— এমন একটা প্রতিষ্ঠানই খুঁজছিলেন এত দিন, যেখানে তৃপ্তির সঙ্গে এবং অনেকটা পারিবারিক পরিবেশে কাজ করা যায়। এ ছাড়া ওই কয়েক দিন বাফেটের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন তিনি, সেটি অগ্রাহ্য করবেন কীভাবে? ফলে পরদিনই জানিয়ে দিলেন, হেলজবার্গ ডায়মন্ড শপের সিইও পদে যোগ দিতে রাজি তিনি।

কী ঘটত যদি বাফেট বেরিলকে আনতে এয়ারপোর্টে না যেতেন? ট্যাক্সি পাঠিয়েই যদি দায়িত্ব সারতেন? শতাধিক প্রতিষ্ঠান তার। এর মধ্যে একজন চাকরিপ্রার্থীর জন্য এতটা করার কী দরকার? বড় বড় সিইও, এমনকি অনেক মিলিয়নেয়ারও তো এতটা খোলামেলা হন না কর্মচারীর সামনে? তাহলে বাফেট কেন করলেন এমনটা? তিনি বিশ্বাস করেন, কর্মীদের অনুপ্রাণিত রাখার প্রথম কৌশল হলো তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ এবং যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান দেয়া। গুরুতর কোনো কারণ না থাকলে এমন পরিস্থিতিতে মানুষ এর বিনিময় দেয়ই।

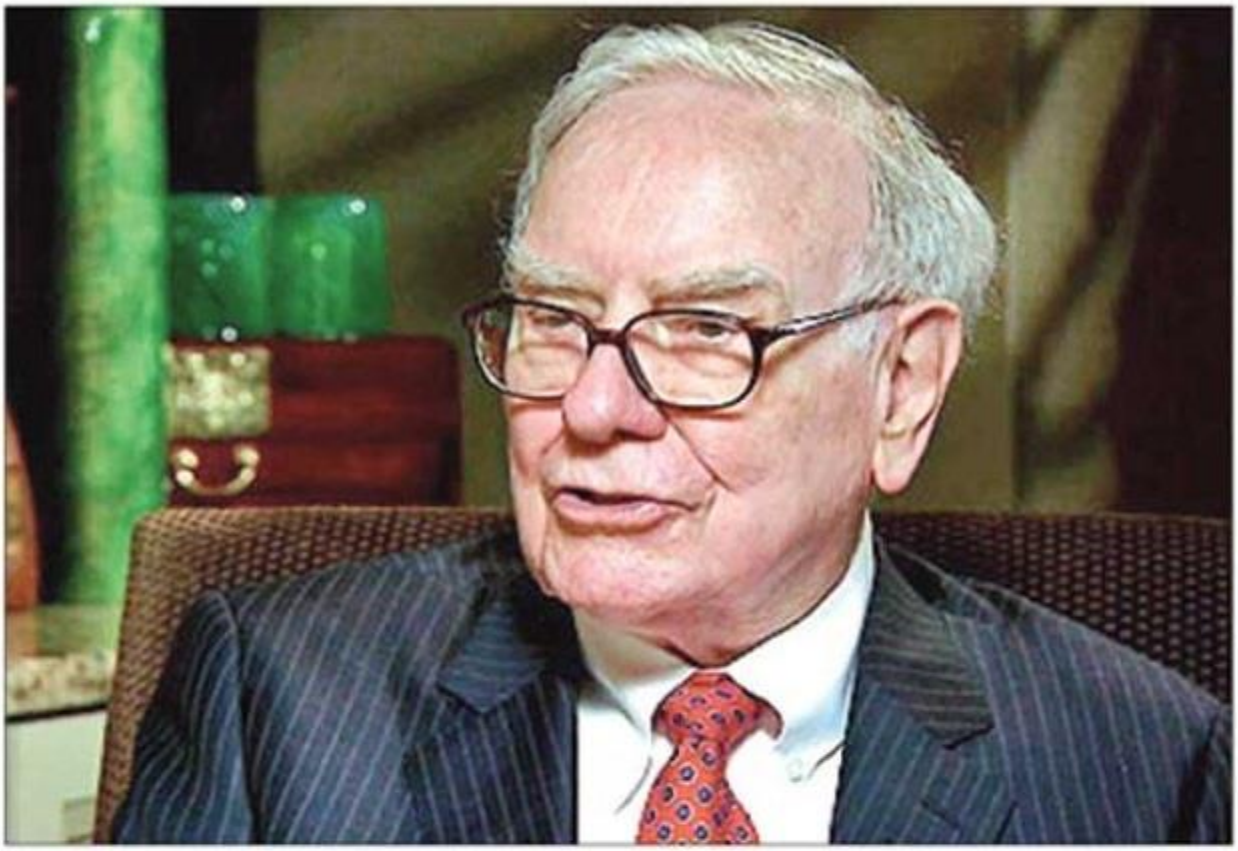

স্বীকৃতি হলো মানবমনের অকৃত্রিম চাহিদা

কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী ও সিইও তরুণ ওয়ারেন বাফেটের চিন্তাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তাদের একজন ইউএস স্টিল কোম্পানির চার্লস মাইকেল স্কোয়াব। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম সেলিব্রিটি ম্যানেজার ও প্রথম মিলিয়ন ডলার সিইও। বছরে বেতন পেতেন ১০ লাখ ডলারেরও বেশি। বাফেট তার সঙ্গে খাতির জমিয়েছিলেন শেয়ারবাজার ও স্টিলের ব্যবসা বুঝতে। স্কোয়াবের ক্যারিয়ারে উত্থান ছিল বিদ্যুৎ চমকের মতো; তার পতনও হয়েছিল দ্রুত। তিনি চাকরি শুরু করেছিলেন অ্যান্ড্রিউ কার্নেগির স্টিল কোম্পানিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। এ সময় তার সঙ্গে সখ্য জন্মে জেপি মরগানের। স্কোয়াবের মার্কিন শেয়ারবাজারে যাওয়া-আসাটাও মরগানের হাত ধরে। তিনি ছিলেন ওয়াল স্ট্রিটের প্রথম দিককার সফল বিনিয়োগকারীদের একজন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে স্কোয়াব প্রেসিডেন্ট হন কার্নেগি স্টিল কোম্পানির। এরপর মরগানের সহায়তায়ই ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দেন ইউএস স্টিল করপোরেশনে। এখানে আসার পর মরগানসহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ঈর্ষার পাত্র অবশ্য হয়ে পড়েন তিনি। বন্ধুত্ব টেকাতে ছেড়ে দেন ইউএস স্টিল; একই পদে চাকরি নেন বেথলেহেম শিপবিল্ডিং অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিতে। কয়েক বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র এ প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি পরিণত করেন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইস্পাতশিল্প ও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ভারী

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিতে। এখানেই তিনি আবিষ্কার করেন দালানকোঠায় বহুল ব্যবহৃত লৌহসামগ্রী এইচ-বিম।

স্কোয়াবের অভ্যাস ছিল জুয়া খেলার। তবে জীবনে হেরেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই। তার বেদনা ছিল সাংসারিক জীবন নিয়ে। স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ছিল গভীর। তা জীবনের শেষ পর্যায়ে একমাত্র মেয়ের অভিভাবকত্ব নিয়ে বিরোধ পর্যন্ত গড়ায়। মেয়েকে না পাওয়ার পর সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণাও জন্মায় তার। এ কারণে ১৯২৯ সালে ওয়ালস্ট্রিট ক্র্যাশের সময় অন্যান্য বিনিয়োগকারীকে 'রিলিফ' দিতে বাজে শেয়ার কিনতে গিয়ে হারান সব নগদ অর্থ। নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে ৭৫ কক্ষবিশিষ্ট এক বিরাট বাড়ি ছিল তার। এটিই সম্ভবত নিউইয়র্কে যেকোনো সময়ের সবচেয়ে বড় বাড়ি। স্কোয়াব এটি দিয়ে দেন স্থানীয় বিল্ডারদের। উদ্দেশ্য ছিল, পানির দামে নিউইয়র্কের মধ্যবিত্তের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা। তার গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল পেনসিলভানিয়ায়। প্রায় চার বর্গকিলোমিটারের এ বাড়িতে রুম ছিল ৪৪টি। মৃত্যুর আগে এটিও দান করে যান সেন্ট ফ্রান্সিস বিশ্ববিদ্যালয়কে। তার নামে কিছু না রাখতেও বলে যান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্কোয়াবের নামে শুধু একটি ক্লাব আছে এখন। এতে যোগ দিতে পারাটা যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য সম্মানজনক বটে।

স্টিল ইন্ডাস্ট্রি স্কোয়াবের চেয়ে কেউ ভালো বোঝেন না, এমন ধারণাই ছিল ওয়ালস্ট্রিটে। বাফেট কথাটা তুলতেই তিনি জবাব দিয়েছিলেন, এটি একটি অতিরঞ্জিত ধারণা। স্টিল বিষয়ে লোকে যতটা ভাবে, তত জ্ঞান নেই তার। একটা ক্ষমতাই তার রয়েছে অন্যদের চেয়ে বেশি, সেটি হলো কাজের বিষয়ে কর্মীদের উদ্দীপ্ত রাখা— তাদের স্বীকৃতি দিয়ে ও ভালো কাজের প্রশংসা করে। স্কোয়াব বলতেন, কর্মীদের স্বীকৃতি দাও; উৎসাহ দাও। দেখবে, তারা সর্বোত্তম দক্ষতাই তোমাকে উপহার দিচ্ছে। নিজে বড় হতে চাইলে কখনো অধস্তনের সমালোচনা করবে না। ভালো মনে না হলে তাকে বিদায় করে দেবে; কিন্তু 'তুমি কিছুই পার না' বলে বকাঝকা করবে না। এটি করলে তার উচ্চাশা ও দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে অনেকটাই। প্রশংসা ও স্বীকৃতি মানুষের বড় প্রেরণা। উইলিয়াম জেমস (স্কোয়াবের প্রিয় আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক) তো লিখেইছেন, মানুষের আদিমতম আকাঙ্ক্ষা হলো অন্যের স্বীকৃতি পাওয়া। তবে খেয়াল রাখা চাই, ভুল ক্ষেত্রে যাতে প্রশংসাটি করা না হয়। প্রশংসার আগে একবার অন্তত ভাবতে হবে— তুমি যে কারণে কারও প্রশংসা করতে চাইছ, সেটি যৌক্তিক কি না। যদি মন বলে কারণটি যৌক্তিক, তাহলে কর্মীদের প্রশংসা করবে সবার সামনে ও একান্তে। অ্যান্ড্রিউ কার্নেগি আমাকে বলেছিলেন, কর্মীদের ছোটখাটো ভালো দিকেরও প্রশংসা করবে। একসময় দেখবে, আরও বড় বড় বিষয়ে তাদের প্রশংসা করার সুযোগ করে দিচ্ছে তারাই।

কাজে লাগান সুনাম ও মহত্ত্ব

ভদ্রলোকের নাম বলা যাবে না। কারণ তিনি এখনো জীবিত এবং বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েতেই কাজ করছেন। ওয়ারেন বাফেটের পুরনো ও বিশ্বস্ত কর্মীদের একজন তিনি। একবার বাফেট খেয়াল করলেন ভদ্রলোক কাজে আনন্দ পাচ্ছেন না। ক্লান্তি ও বিরক্তি নিয়ে অনেকটা রোবটের মতো করে চলেছেন কাজকর্ম। সহকর্মীরা বাফেটের কাছে অভিযোগ করলেন, তার মনোযোগ কমে গেছে; সঙ্গে কর্মনৈপুণ্য। বাফেট ভাবছিলেন কী করা যায়? বিদায় করে দেবেন? তাহলে তো নতুন লোক খুঁজতে হয়। চাকরি খাওয়ার হুমকি দেব? বলব কী— কাজে গাফিলতি চলতেই থাকলে ছয় মাসের মধ্যে অন্য কোথাও কাজ খুঁজতে হবে তোমাকে? কিন্তু এত সিনিয়র লোক, বিষয়টিকে যদি অপমান হিসেবে নেন? অনেক ভেবে বাফেট ঠিক করলেন, আগে বরং কথা বলি। ভদ্রলোককে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানালেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আলাপ চলতে লাগল। শরীর-স্বাস্থ্য কেমন? পরিবার-পরিজন কেমন আছে? কেমন চলছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া? ভবিষ্যতের জন্য অর্থকড়ি জমাচ্ছেন কি না প্রভৃতি। এসব বলে বাফেট আসলে বুঝতে চেয়েছিলেন, ভদ্রলোকের কোনো রকম শারীরিক-মানসিক অশান্তি আছে কি না। যেই বুঝলেন তেমন কিছু নয়। তিনি কৌশলে বলতে লাগলেন তার পরও কোনো সমস্যা থাকলে জানাও। হয়তো সমাধান করতে পারব না, কিন্তু তুমি তো

হালকা হবে। এত দিন ধরে কাজ করছ বার্কশায়ারে। আমি তোমাকে এখানকার শ্রেষ্ঠ কর্মীর একজন ভাবি। তোমাকে দেখিয়ে অনুপ্রাণিত করি অন্যদের। সবাই বলে, আমিও স্বীকার করি তোমার মতো কর্মী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ কয়েক মাস ধরেই দেখছি, কাজে মন নেই তোমার। তাই ভাবলাম, এ বিমর্ষতা কাটাতে সাহায্য করা যায় কি না। যে কারণেই ভদ্রলোকের কাজে মনোযোগ কমে গিয়ে থাক, বাফেট কথা বলার পর দিনই তাকে আগের মতো উদ্যমী দেখা গেল। কেন? কারণ মানুষের স্বভাবই হলো, সুনাম করা হলে সে উপাদান তার মধ্যে না থাকলেও ওই ব্যক্তি সেটি অর্জন করে নিতে চায়। এ জন্যই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে বা লজ্জা দিয়ে কাজ আদায় করতে চাইলে হতাশ হতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দোষত্রুটি দেখিয়ে অভিযুক্ত করলে মানুষ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়; নিষ্ক্রিয়তা দেখায়।

বাফেট কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রশংসা করেন বার্কশায়ারের দক্ষ ম্যানেজারদের। প্রতি বছর বার্কশায়ারের শেয়ারহোল্ডারদের কাছে একটি চিঠি যায়। তাতে কোম্পানির আয় বিবরণীর সঙ্গে যুক্ত থাকে— কোন ক্ষেত্রে তার কোন ম্যানেজার, কোন সিইও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন গত বছর, তার খতিয়ান। বাফেট তাদের প্রশংসা করেন বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা সুযোগ পেলে সংবাদ সম্মেলনে; তাদের প্রশস্তি করেন একান্তে ডেকেও। এসব করে বার্কশায়ারের সিইও-ম্যানেজারদের আসলে বুঝিয়ে দিতে চান— যে সুনাম তাদের গড়ে উঠেছে, সেটি যেন কোনোভাবে বিনষ্ট না হয়।

একবার জনপ্রিয় ইউ-টু ব্যান্ডের পল ডেভিড হিউসন (বোনো) এলেন বাফেটের কাছে। উদ্দেশ্য আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে বাঁচাতে আমেরিকাজুড়ে চ্যারিটি কনসার্ট আয়োজন। তিনি বাফেটের কাছে পরামর্শ চান, কী করলে আমেরিকানরা এমন কাজে তাদের হাত 'স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি' বাড়িয়ে দেবে? কীভাবে সহজে অনুপ্রাণিত করা যায় মার্কিন জনসাধারণকে? বোনোর আসলে কী করা উচিত? আমেরিকার বিবেকের কাছে প্রশ্ন তোলা— আফ্রিকায় লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে আর তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে রয়েছ? নাকি কনসার্টটির স্লোগান হবে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে আফ্রিকা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ো? বাফেট শুরুতেই বললেন, আমেরিকার বিবেক নিয়ে প্রশ্ন তুলো না। তার মহত্ত্বের কাছে বরং আবেদন জানাও। তাহলেই তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আমেরিকার বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই পাবে তুমি। এমনটি করলে আমার মনে হয়, যেকোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীই এর ভিন্ন আচরণ করবে না। তুমি কেন এটি বল না যে, উন্নত দেশের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক আমেরিকানেরই উচিত নিজ থেকে আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। বাফেটের এ কথাগুলো পয়েন্ট আকারে টুকে নিয়েছিলেন বোনো। পরে এ থেকে একটি ভাষণও দাঁড় করান, যেটি আমেরিকাজুড়ে চলা প্রতিটি চ্যারিটি কনসার্টেই দিয়েছেন তিনি। 'আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাতির বাসস্থান। আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিতেছিল সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। চাঁদের বুকে প্রথম পদচিহ্ন একজন আমেরিকানেরই। ...যখন দেখলাম আফ্রিকার হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরছে, তৃষ্ণায় ছটফট করছে শিশুরা, ভেবে পাচ্ছিলাম না এ নিয়ে কার কাছে যাব, কার সাহায্য চাইব? তখনই মনে পড়ল বিশ্বে একটি জাতি আছে, যারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে জানে। তারা পারবে এ প্রতিকূলতা জয় করতে, আফ্রিকার মানুষকে সাহস জোগাতে। তাই আমি তোমাদের কাছে এসেছি।' এমন একটি ভাষণ বোনোকে এনে দিয়েছিল অভাবনীয় সাফল্য। বাফেটকে নোটও পাঠিয়েছিলেন তিনি, পরামর্শে কাজ হয়েছে; ধন্যবাদ।

প্রশংসা নাম ধরে আর তিরস্কার খাতওয়ারি

কর্মী উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল হিসেবে হঠাৎ কারও সমালোচনা কাজে আসে না সিংহভাগ ক্ষেত্রেই। উল্টো কর্মীর মনে জন্ম দেয় অপমানবোধের। ফলে যত সঙ্গতই হোক, যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা— সে তা প্রত্যাখ্যান করে তৎক্ষণাৎ। অপ্রত্যাশিত সমালোচনা অনেক কিশোর-কিশোরীকে পরিবারবিমুখ করে তোলে, বাড়ি ছাড়তেও প্ররোচিত করে। বিফল দাম্পত্য জীবনেরও অন্যতম কারণ এটি। কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্বুদ্ধ বা শুধু তিরস্কার করতেই বসরা কর্মীদের সমালোচনা করেন। যে কারণেই করা হোক, এ থেকে কোনো সুফল মেলে না বলে মনে করেন ওয়ারেন বাফেট। তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে সমালোচনা বিনষ্ট করে 'প্রোডাক্টিভ ওয়ার্কিং রিলেশন'। তার বদলে উচিত কর্মীদের ভুল ধরিয়ে দেয়া এবং সেটি শোধরানোয় সহায়তা জোগানো। এতে হতোদ্যম হবে না তারা, বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সফলতার পথেই এগোবে।

বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে অধিভুক্ত মিডআমেরিকান এনার্জি কোম্পানির সিইও ডেভিড সোকোল বাফেটের টপ ম্যানেজারদের একজন। তার দক্ষতা, চারিত্রিক সংহতি যে কারও সন্দেহের উর্ধ্বে। ডেভিডের একটি দুর্বলতাই ছিল চোখে পড়ার মতো। তা হলো, কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে মাঝে মধ্যে তিনি আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতেন। একবার মিডআমেরিকানের তহবিল থেকে ৩৬০ মিলিয়ন ডলার সরিয়ে জিংক (দস্তা) কারখানা

খোলেন এবং এতে তিনি ব্যর্থ হন শোচনীয়ভাবে। বছরশেষে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখেন, ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। এ অবস্থায় তো আর বাফেটের মুখোমুখি হওয়া যায় না। চাকরি এমনিতেই যাবে। এর চেয়ে ভালো, দায় কাঁধে নিয়ে নিজেই চাকরি ছেড়ে দেয়া। ডেভিড ওই বছর আর গেলেন না বার্কশায়ারের বার্ষিক মিটিংয়ে। বদলে পাঠিয়ে দিলেন অধস্তন আরেক কর্মকর্তাকে। বাফেট দুঃসংবাদটা শুনলেন তার কাছেই। মিটিংশেষে তিনি চলে গেলেন ডেভিডের বাসায়। ঢুকেই বললেন— মিটিংয়ে খাইনি, ভাবলাম তোমার সঙ্গে খাব। কী আছে নিয়ে এসো। ডেভিড ভয়ে ছিলেন, তিরস্কার পর্বটা না খাওয়ার মধ্যেই শুরু হয়ে যায়! কিছুক্ষণ পর জিংক কারখানার প্রসঙ্গ তুললেন বাফেট। কিন্তু বকাঝকার ধারেকাছেও না গিয়ে ডেভিডকে বললেন— এত আপসেট হয়ে পড়েছ কেন? সবারই ভুল হয়। ভুল তো জীবনে আমিও কম করিনি। অতঃপর তিনি শোনাতে লাগলেন বাফেটের ব্যর্থতার ফিরিস্তি। গল্প শুনে একসময় স্বাভাবিক হলেন ডেভিড। যাওয়ার সময় বাফেট কেবল বললেন— কাল অফিসে যেয়ো, গিয়ে দেখো জিংক কারখানায় কী ভুল করেছিলে। সেগুলো শুধরে নাও। দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। বাফেটের পরামর্শ কাজে এসেছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে মিডআমেরিকান এনার্জি কোম্পানিকে বার্কশায়ারের অন্যতম লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন ডেভিড। এটা কি সম্ভব হতো যদি বাফেট তাকে বলতেন— এখনই পাওনা নিয়ে আমার কোম্পানি থেকে বিদায় হও, ইডিয়ট!

সমস্যা হলো, মাঝে মধ্যে সমালোচনা, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তখন কী করা? এ সমস্যা সমাধানে বাফেট একটি উপায় বের করেছেন। তিনি মনে করেন, এটিই তার 'গ্রেটেস্ট ম্যানেজেরিয়াল সিক্রেটস'। তা হলো— প্রশংসা করা নাম ধরে এবং ক্যাটাগরিক্যালি তথা খাতওয়ারি তিরস্কার করা। বাফেট ছবি মিলিয়ে বার্কশায়ার অধিভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের সিইও-ম্যানেজারের নাম মুখস্ত করতেন অবসরে। সেসবে যাওয়ার আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রোফাইল দেখে নিতেন, যাতে নাম ধরে তাদের সম্বোধন করা যায়। মিটিংয়েও নাম ধরে প্রশংসা করতেন তিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাম না ধরে প্রশংসা করা যায় না? তার জবাব ছিল— যায়; তবে কথা হলো অন্যের মুখে নিজের নামসহ প্রশংসা শুনতে সবাই ভালোবাসে। সুতরাং প্রশংসার সময় নাম ধরে বলো, তাতে তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

সরাসরি সমালোচনা না করলেও কয়েকজন ম্যানেজারের কাজে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন বাফেট। সে ক্ষেত্রে তাদের তিরস্কারের দুটি পদ্ধতি ছিল তার। এক. সবার সামনে কিছু না বলে ব্যক্তিগতভাবে রুমে ডেকে নেয়া। তারপর প্রশংসা দিয়ে শুরু করে তিরস্কারের ঝড় (এটি বেশি বিরক্ত হলেই করতেন) তোলা। তবে আজেবাজে কথা তিনি বলতেন না কখনই। দুই. ক্যাটাগরিক্যালি অর্থাৎ খাত ধরে তিরস্কার করা আর সেটি সবার সামনেই। এ ক্ষেত্রে তিনি কারও নাম ধরে কিছু বলতেন না। শুধু বলতেন— অমুক কোম্পানি গত বছর আমাকে হতাশ করেছে; তাদের কাছ থেকে আরও 'বেটার পারফরম্যান্স' আশা করি আমি। এমন আচরণের পেছনে তার যুক্তি হলো— তিরস্কার করলে মানুষ অপমানিত হবেই। কে কতটা অপমান সহ্য করতে পারে, তা যদি না জান— অপমান সবার মধ্যে ভাগ করে দাও, ক্যাটাগরিক্যালি তিরস্কার করো তাদের।

বাফেট সুকৌশলে ক্যাটাগরিক্যালি তিরস্কার করতে পারতেন প্রকাশ্যেও। একবার তিনি বিপুল বিনিয়োগ করেছিলেন পেট্রোচায়নায়। কোম্পানিটি ছিল চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (সিএনপিসি) অধীনে। সিএনপিসি একবার বিনিয়োগ করল সুদানে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মার্কিনরা। পেট্রোচায়নায় বিনিয়োগের 'অপরাধে' বার্কশায়ার শেয়ারহোল্ডারদের তোপের মুখে পড়লেন বাফেটও। এতে বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। কারণ শেয়ারহোল্ডাররা কিছু না বুঝেই অভিযুক্ত করছিলেন তাকে। বাফেট কিন্তু পরিস্থিতির সামাল দিলেন সুকৌশলে। শুরুতেই বললেন, শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষোভের কারণ তিনি বোঝেন। আর তিনি খুশি এটি ভেবে যে, বার্কশায়ারের শেয়ারহোল্ডাররা বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে শুধু সচেতন নয়, সিরিয়াস বটে। এ ধরনের শেয়ারহোল্ডার অন্য প্রতিষ্ঠানে রয়েছে কি না, তার সন্দেহ রয়েছে। তবে কথা হলো, তারা ভুল বুঝেছেন পেট্রোচায়নায় বার্কশায়ারের বিনিয়োগ নিয়ে। সুদানে বিনিয়োগ করেছে সিএনপিসি— তাদের কোম্পানি (পেট্রোচায়না) নয়। বাফেটের ব্যাখ্যা শুনে শেয়ারহোল্ডাররা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন তাকে 'সরি' বলে।

জিততে চাইলে কিছু ক্ষেত্রে হারতে হবে

বহুমুখী প্রতিভা বলতে যা বোঝায়, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন তা-ই। তার বিদ্যুৎবিষয়ক তত্ত্ব এখনো পদার্থবিজ্ঞানে পাঠ্য। বাইফোকাল লেন্সের আবিষ্কারক তিনি। তার উদ্ভাবিত অডোমিটার পরিণত হয়েছে জিপিএস ডিভাইসে। সঙ্গীতেও আগ্রহ ছিল ফ্রাঙ্কলিনের। হারমোনিকা কীভাবে কাজ করে, তা বুঝে নিয়ে নিজেই তৈরি করেছিলেন গ্লাস আর্মোনিকা। এখনো বিভিন্ন মিউজিক্যাল শো-তে ব্যবহৃত হয় এটি। ছিলেন বড় মাপের কূটনীতিক। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল মিত্র ফরাসিদের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা করা। ফরাসিদের ওপর তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। ফ্রেঞ্চ নীতিনির্ধারকরা বলতেন, 'ওয়াইল্ড আমেরিকা'য় যে কয়েকজন মার্জিত ব্যক্তি রয়েছেন— ফ্রাঙ্কলিন তাদের অন্যতম। তিনি দার্শনিকও ছিলেন। অবশ্য দার্শনিক না বলে দর্শনের ছাত্র হিসেবেই পরিচয় দিতেন নিজেকে। এত সব ছাপিয়ে সাধারণ আমেরিকানের কাছে তার বেশি পরিচিতি সিভিল সোসাইটির সমর্থক, প্রাজ্ঞ রাজনীতিক ও বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের 'ফাউন্ডিং ফাদার' হিসেবেই।

ব্রিটিশ কলোনি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে মুক্ত করার পর ফ্রাঙ্কলিনদের (জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, জন অ্যাডামসসহ অনেকে) মনে প্রথম যে চিন্তাটা জাগল— তা হলো, তারা যেহেতু আমেরিকার 'ফাউন্ডিং ফাদারে' পরিণত হয়েছেন; লোকে তাদের অনুসরণ করবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে। ফলে তাদের দায়িত্ব এমন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে আগামী প্রজন্মের আমেরিকানরাও উন্নততর জীবন বেছে নিতে পারে; বেপথে যেন না যায়। ফ্রাঙ্কলিনের চিন্তাটা ছিল, তিনি বই লিখবেন— ভবিষ্যতেও পুরনো মনে হবে না, এমন সব আর্থসামাজিক ইস্যু নিয়ে। লিখলেনও তিনি। এরই এক অধ্যায় ছিল— যুক্তিতর্ক, সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি, পরমতসহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত। এতে তিনি লিখেছিলেন, বাক্যের ভুল গঠন এবং শব্দের অসঙ্গত ব্যবহারও সৃষ্টি করতে পারে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব। সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি এড়াতে পরিত্যাগ করতে হবে 'নিঃসন্দেহে', 'অবশ্যই' জাতীয় শব্দ। তার বদলে 'মনে হয়', 'আমার ধারণা', 'এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে' জাতীয় শব্দের প্রচলন ঘটানো দরকার। এ ধারায় চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন আনতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজ আদর্শ ও মতের পক্ষে আমাদের অবস্থান যত শক্তিশালীই হোক— তার উপস্থাপনা হতে হবে এমন, যাতে কেউ আহত না হয়। আর অন্যের মত যদি আমাদের চিন্তাধারার বিপরীত বা তুচ্ছও হয়, অশ্রদ্ধা দেখানো যাবে না তার প্রতি। খেয়াল রাখতে হবে, বিজয়ী হতে চাইলে কিছু না কিছু ক্ষেত্রে হারতেই হয় মানুষকে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের লেখা বইটি পড়েছিল দুই বন্ধু ওয়ারেন বাফেট ও চার্লি মানজারের হাতে। তারা দুজনই তখন নিউইয়র্ক শেয়ারবাজারে; কাজ করতেন গেইকো (প্রতিষ্ঠানটি পরে কিনে নিয়েছিলেন বাফেট) সিকিউরিটিজের সেলসম্যান হিসেবে। দুই বন্ধুই ওয়াল স্ট্রিটে নতুন, বাজারের হাবভাব তেমন বুঝতেন না। বেতনও ছিল কম। তার পরও লেগে থাকলেন শেয়ারবাজারের ওপর বিস্তারিত ধারণা নিতে। সেলসম্যান হিসেবে তাদের দায়িত্ব ছিল— সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের টার্গেট করা, তাদের গেইকোর শেয়ার কিনতে উদ্বুদ্ধ করা। ওয়াল স্ট্রিটে নতুন আসা বিনিয়োগকারীদের পটানো কঠিন ছিল না। সমস্যা দেখা দিত ঝানু বিনিয়োগকারীদের কাছে গেইকোর শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে। তাদের কারও কাছে হয়তো

গেছেন বাফেট ও মানজার। কিছু বলতে যাবেন, ওই মুহূর্তেই ভদ্রলোক উল্টো একটা লেকচার দিয়ে দিলেন— গেইকোর শেয়ার কেন কিনব? আমি বরং ফিলিপ মরিসের শেয়ার কিনব। শুরুতে এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে আহত হতেন বাফেট; মাঝে মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন চার্লি মানজারও। এরই মধ্যে পুরনো বইয়ের দোকানে পেলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বইটি। সূচিপত্রে দেখলেন যুক্তি-তর্ক-দ্বন্দ্ব বিষয়ে লেখা। কাজে লাগবে মনে হলো, তাই কিনেও নিলেন। বইটি পড়ে ধারণা হলো— তারা যেভাবে ক্রেতা ধরতে চাইছেন, সেটি সঠিক পথ নয়। সাংঘর্ষিক উপায়ে ক্রেতার আস্থা অর্জন করা যাবে না। তাকে কেবল শোনাতে চাইলে হবে না; ক্রেতার কথা শুনতে হবে আগে। পরদিনই দুই বন্ধু নেমে পড়লেন ফ্রাঙ্কলিনের থিওরির বাস্তবায়নযোগ্যতা দেখতে। যেই কেউ বলা শুরু করতেন, তোমার শেয়ার কেন কিনব; ফিলিপ মরিসের শেয়ার কিনব— তখনই দুই বন্ধু বলতেন, খুবই ভালো, বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত। ফিলিপ মরিসের মতো লাভজনক প্রতিষ্ঠান কমই আছে। তবে গেইকোর শেয়ার কিনলেও আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। ওয়ালস্ট্রিটে নতুন এসেছি আমরা। এরই মধ্যে সবাই আমাদের কোম্পানিটির সম্ভাবনা নিয়ে বলাবলিও করছে। আপনি সব কিছু নিজে যাচাই করুন; আমার মনে হয় গেইকোর শেয়ার আপনার জন্য লাভজনকই হবে। ফ্রাঙ্কলিনের চিন্তা-দর্শন কাজে আসতে লাগল। ওয়ারেন বাফেট ও চার্লি মানজার ভালোভাবেই উপলব্ধি করলেন— বিজয়ী হতে চাইলে কিছু ক্ষেত্রে হারতে হয়, কাউকে কিছু শোনানোর আগে ওই ব্যক্তির কথা শুনতে হয়।

বুঝতে চেষ্টা করুন অন্যের চাহিদা

ছোটবেলা থেকেই 'বিনিয়োগকারী' হতে চাইতেন বাফেট। এ ক্ষেত্রে তার প্রথম অনুপ্রেরণা হলো কিংবদন্তি মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড। ফোর্ডের একটি কথা খুব মনে ধরেছিল তার। তিনি বলেছিলেন, সাফল্যের গোপন কারণ বলতে সত্যি যদি কিছু থাকে, তা মানুষের একটি ক্ষমতার মাঝেই নিহিত। সেটি হলো একবার অন্যের চোখ দিয়ে, আরেকবার নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা। কথাটিকে বাফেট অবশ্য ঘুরিয়ে বলতেন, যদি কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে চাও; তুমি কোনটি চাও বা এ বিষয়ে তোমার ভাবনা কী— এসব ভুলে যাও। বুঝতে চেষ্টা কর, অন্য পক্ষ কী চাইছে? আর তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা কী কী? বাফেটের মতে, এভাবে চিন্তা করতে পারাটা সফল ম্যানেজার, এমনকি মালিক হওয়ার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যের অবস্থান থেকে নিজেকে দেখার এ অনুশীলন বাফেট করেন ব্যক্তিজীবনেও। স্ত্রী-সন্তানদের সমস্যা তিনি সবসময়ই দেখেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নিজের মতামত তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা তার ছিল না কখনই। কখনো বলেননি— তোমাকে অমুক হতে হবে। বাফেটের তিন সন্তানের একজন হয়েছেন সমাজকর্মী, একজন কৃষক (ভদ্রলোক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এ পেশায় নেমেছেন) ও তৃতীয়জন মিউজিশিয়ান। তাদের প্রত্যেককেই বাফেট বড় হতে দিয়েছেন নিজের মতো করে। সন্তানদের কোনো বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না, তা অবশ্য নয়। মাঝে মধ্যে করতেন, যদি দেখতেন— সন্তানের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাও করতেন কৌশলে। যেমন একবার

বাফেট লক্ষ্য করলেন, তার বড় ছেলে অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন এর কারণ— অতিরিক্ত ফাস্টফুড ও চকলেট খাওয়া। ডেকে পাঠালেন ছেলেকে। কিন্তু একটুও বকলেন না তাকে। শুধু বললেন, এক কেজি করে ওজন কমাতে পারলে ১০০ ডলার 'রেডি ক্যাশ' দেয়া হবে। আরও চকলেট কেনা যাবে ভেবে ছেলে উৎসাহ নিয়ে কমাতে লাগল তার ওজন। ডায়েটিংয়ে চকলেটের ব্যাপারে আসক্তিও কমে এল এক পর্যায়ে।

একসময় বাজারে গুজব রটছিল, বাফেট লোকজনকে ভয় দেখিয়ে কম দামে কোম্পানি কিনে নিচ্ছেন। এমন কথা চালু হওয়ার কারণ ছিল, তিনি অন্যদের চেয়ে অনেক কম দামে ও মাঝে মধ্যে বাজারমূল্যের চেয়েও কমে কিনে নিতেন প্রাইভেট কোম্পানি। অতঃপর যাদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তারাই পাবলিকলি বক্তব্য দিতেন— যাতে বাফেটের মতো মানুষের সুনাম ক্ষুণ্ন না হয়। তাদের একজন একবার বললেন, বাফেট কোনো প্রকার ভয়ভীতি দেখায়নি তাকে। বরং সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তিনি নিজেই নিয়েছেন কোম্পানি বিক্রির সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন করা হলো, এত কম দামে বেচলেন যে? এর চেয়েও ভালো অফার তো ছিল? ভদ্রলোক বললেন, কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি বাফেটের কাছেই কোম্পানি বেচেছেন। এতে দেখা দিল আরেক সমস্যা। লোকে ভাবতে শুরু করল, ওয়ারেন বাফেট একজন অসাধারণ নেগোশিয়েটর। কথায় মানুষকে আচ্ছন্ন রাখতে পারেন। বাফেট অবশ্য বলেন, এসব অতিরঞ্জিত বক্তব্য। কৌশল জানা থাকলে যে কেউ আমার মতো নেগোশিয়েটর হতে পারবে। নেগোশিয়েট করতে বেশি কিছু লাগে না— কেবল অন্যের দৃষ্টিতে গোটা পরিস্থিতি একবার দেখে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্যটি তাতে যুক্ত করতে পারলেই হলো। বাফেট দেখতে পেয়েছেন, সাধারণ মার্কিন উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান বিক্রির ক্ষেত্রে এরা অর্থকে প্রাধান্য দেয় না; এ ক্ষেত্রে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ। এরা জানতে চায়, বিক্রির পর তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইট চোখের সামনে খসানো হবে না তো? পুরনো কর্মীদের রাখবে কি নতুন মালিক? অধিকাংশ আমেরিকান চায় না, তার গড়া প্রতিষ্ঠান নতুন মালিক এসে 'ঢেলে সাজাক'। সে ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়েও ছাড় দিতে রাজি তারা। কম দাম পেলেও তারা চান এমন কারও কাছে কোম্পানি বেচতে, যিনি অন্তত ওসবে যাবেন না।

রোজ ব্লাম্পকিনের (মিসেস বি) কাছে বাফেট গিয়েছিলেন তার নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্ট (এনএফএম) কিনতে। তার আগেই এক জার্মান এনএফএম কেনার প্রস্তাব দেন ৮০ মিলিয়ন ডলারে। মিসেস বি প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞেস করেন, আউটলেটটি 'ঢেলে সাজানো' হবে না তো? উত্তর এসেছিল 'হ্যাঁ'। পরের প্রশ্নটি ছিল, বিক্রির পর পুরনো কর্মীরা কি তাদের পদে বহাল থাকবে? জবাবে জার্মান ভদ্রলোক বলেন, যেহেতু কোম্পানির ১০০ শতাংশই কিনে নেয়া হবে, পুরনো কারও চাকরি থাকবে না। মিসেস বি সঙ্গে সঙ্গেই 'না' জানিয়ে বিদায় করে দেন ভদ্রলোককে। ঘটনাটি জানতেন বাফেট; এনএফএমের সঙ্গে মিসেস বির আবেগপূর্ণ সম্পর্কও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন এনএফএম কিনতে চান, তবে পুরোটা নয়— এর ৯০ শতাংশ। বাফেটের এও ইচ্ছা, যেহেতু ফার্নিচার ব্যবসায় তার ভালো জ্ঞান নেই, তাই মিসেস বি-ই পরিচালনা করুন এটি। এনএফএমকে তার চেয়ে ভালো কে বুঝবে? সমস্যা হচ্ছে, ওই কোম্পানির ৯০ শতাংশ কিনতে ৪০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয়ের সাধ্য যে নেই বাফেটের! এ অবস্থায় বিক্রির পরও নিজের গড়া কোম্পানির ১০ শতাংশ মালিকানা থাকবে, পুরনোদেরও চাকরি যাবে না— এ দুটি বিষয় ভেবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন মিসেস বি। ৪০ মিলিয়ন ডলারেই এনএফএমের ৯০ শতাংশ বেচলেন বাফেটের কাছে।

ফ্লাইটসেফটি কোম্পানি কেনার সময়ও ঘটে একই ঘটনা। ভালো ভালো প্রস্তাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত বাফেটের কাছেই কম দামে এটি বিক্রি করেন অ্যালবার্ট লি ইউয়েশলি। তার কাছে মনে হয়েছিল, অন্যদের কাছে কোম্পানিটি বিক্রি করলে চুক্তির পরদিনই তাকে খেদিয়ে দেয়া হবে। অথচ বাফেট তাকে এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকার সুযোগ দিচ্ছেন! দুটি ক্ষেত্রেই বাফেটের সফলতার কারণ ছিল, তিনি জানতেন অন্য পক্ষ কী চায়।

আদেশ না দিয়ে কর্মীর মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলুন

সহকর্মীদের কাছে বাফেটের একটি আচরণ অদ্ভুত মনে হয়। হয়তো কাউকে নতুন চাকরি দিলেন, কিন্তু অনেক দিন তার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না ব্যবসা বিষয়ে। এমন বিষয়েও না— কোম্পানিতে তাদের কাজ কী বা বাফেট কেমনটা চান? প্রকৃতপক্ষে এটিও তার এক বড় ম্যানেজমেন্ট কৌশল। বাফেট চাইতেন, নিজে থেকেই প্রত্যেকে কাজের ব্যাপারে লক্ষ্যমাত্রা ও মানদণ্ড নির্ধারণ করুক; আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক সমস্যা সমাধানে, যাতে ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়ে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা না করে— স্যার, আমি এ বিপদে পড়েছি, কী করব বলুন? বাফেট দেখেছেন, মালিক বা ম্যানেজাররা যদি কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেন— অধিকাংশ কর্মী সেটি নেয় অন্যের 'আইডিয়া' হিসেবে। স্বভাবতই সে মন থেকে মেনে নিতে পারে না এটি। কিন্তু কাউকে যদি নিজে থেকে লক্ষ্যমাত্রা ও মানদণ্ড নির্ধারণের স্বাধীনতা দেয়া হয়, সেটিকে সে নিজের 'আইডিয়া' বলেই গ্রহণ করে এবং সিংহভাগ ক্ষেত্রে 'গোলস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস' সেট করে— যতটুকু করা সম্ভব, তার চেয়েও বেশি। বিষয়টি তখন মালিক বা ম্যানেজারের লড়বার বিষয় থাকে না; হয়ে যায় নিজের 'ফাইট'। বাস্তবতা হলো— সব মানুষই চায় নিজের ফাইটটা ভালোমতো করতে।

একটি গল্প মাঝে মধ্যে শোনাতেন বাফেট। গাড়ির দোকানে সেলস ম্যানেজার ছিলেন এক

লোক। তাদের গাড়ির দাম ছিল প্রতিযোগিতামূলক। শোরুমও ছিল সহজে চোখে পড়ার মতো জায়গায়। বিজ্ঞাপনও কম দিতেন না তারা। তা সত্ত্বেও বাড়ছিল না বিক্রি। অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলো মুনাফা অর্জন করছিল ব্যাপকভাবে। দেখা গেল, সমস্যা আসলে সেলস টিমেই। তারা কাজের চেয়ে নিজেরা গল্প করে বেশি। দিনশেষে বাড়ি ফেরা ছাড়া বিক্রি কীভাবে বাড়ানো যাবে, এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনাই মাথায় থাকে না তাদের। সেলস ম্যানেজারের কথাও ভালোভাবে শোনে না। প্রশিক্ষক এনে তাদের মোটিভেশনাল ট্রেনিং দেয়া হলো। রোগ সারল না। উপায় না দেখে শেষ প্রয়াস নিলেন সেলস ম্যানেজার। টিমের সবাইকে ডেকে বললেন— ম্যানেজার হিসেবে তার কাছ থেকে কেমনটা আশা করে তারা? প্রত্যেকেই জানাল তাদের দাবি-দাওয়া। এর মধ্যে যৌক্তিকগুলো পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন ম্যানেজার। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সেলস টিমের কাছে ম্যানেজারের প্রত্যাশা কী থাকা উচিত? একজন 'সততা', আরেকজন 'পরিশ্রম', কেউ কেউ 'ঐক্যবদ্ধতা', 'আশাবাদী থাকা' প্রভৃতির কথা বলতে থাকল। এবার ম্যানেজার ভদ্রলোক বললেন, তিনি তাদের আশা পূরণ করবেন; তাদেরও উচিত হবে তার আশা পূরণ করা। এতে সেলস টিম এতটাই সেলফ-মোটিভেটেড হয়েছিল যে, পরের বছর রেকর্ড গাড়ি বিক্রি হলো কোম্পানিটির।

বাফেটের ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত জীবনে আসা যাক। একবার দেখা গেল, বার্কশায়ারের অধিভুক্ত এক প্রতিষ্ঠানে মুনাফা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এ পরিস্থিতিতে অন্য কেউ হলে হয়তো কোম্পানির পদস্থ কর্মকর্তাদের ডেকে বকাঝকা করতেন। সেসব কিছুই করলেন না বাফেট। তিনি সব কর্মীকে একত্র করে বললেন— খুবই দুঃখজনক, গত বছর আমাদের লস হয়েছে। অবশ্য তার যৌক্তিক কারণ ছিল। তবে আমার বিশ্বাস, মূল সমস্যাগুলো দূর হয়েছে এরই মধ্যে। এ অবস্থায় চলতি বছরই যদি কোম্পানির মুনাফা বাড়ে, খুব খুশি হব আমি। আশাও করছি, তেমনটি ঘটবে। এ অবস্থায় কী হারে সবাইকে ক্রিসমাস বোনাস দেয়া হবে, সেটিও হিসাব করে রেখেছি। বাফেটের এ কথায় কর্মীরা সেলফ-মোটিভেটেড হওয়ায় ঠিক পরের বছরই মুনাফা বেড়েছিল।

একবার দেখা গেল, বাফেটের মেজ ছেলে যাচ্ছেতাই রেজাল্ট করতে লাগল স্কুলে। বাফেট তাকে বকা না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবার কাছে তার কোনো আবদার আছে কি না। বিরাট এক তালিকা ধরিয়ে দিল ছেলে। এর মধ্যে বিলাসদ্রব্য বাদ দিয়ে কোনগুলো বেশি প্রয়োজনীয়, তা বাছাই করতে লাগলেন দুজন মিলে। এরপর শর্ট লিস্ট তৈরি হলে বাফেট পূরণ করলেন প্রতিটি আবদার। শেষে শুধু বললেন, ছেলে হিসেবে এবার তারও উচিত বাবার আবদার পূরণ করা। বাফেটের চাওয়া অবশ্য বেশি কিছু নয়। তিনি কেবল চান— তার সন্তান ক্লাসের প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকুক। বাফেটের কথায় সেলফ-মোটিভেটেড হয়ে পরের বার ক্লাসে ফার্স্টই হয়ে বসল ছেলেটি।

বাফেট বলতেন, সরাসরি আদেশ সামরিক বাহিনীতে কাজে আসতে পারে। তবে বেসামরিক জীবনে, বিশেষত কর্মক্ষেত্রে তিক্ততাই সৃষ্টি করে এটি। তার চেয়ে ভালো হলো মানুষকে প্রশ্ন করা, মাঝে মধ্যে সাজেশন দেয়া। এর ভেতর দিয়েই ম্যানেজার যা চান, সেটির বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব। একবার বার্কশায়ারেরই একটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন এক ভদ্রলোক। চাকরিতে যোগদানের কয়েক দিন পর বাফেট এলেন তার বাসায়। কুশল বিনিময়ের পরই জিজ্ঞেস করলেন— কেমন দেখলে? পরিস্থিতি কী? শ্রমিক, মেশিনপত্র সব ঠিক আছে? এ দিকটায় অবশ্য খুব বেশি আসা হয় না আমার। এত সব মেশিনপত্রও ভালো বুঝি না। ফলে আমার পরামর্শ তোমার খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। যা করার করতে হবে তোমাকেই। এ ভদ্রলোক পরে বার্কশায়ারের অন্যতম সফল ম্যানেজারে পরিণত হয়েছিলেন। অথচ কী হতো, বাফেট যদি তাকে সরাসরি বলতেন— এভাবেই কোম্পানি চালাতে হবে কিংবা ওইটি কোনোমতেই করা যাবে না!

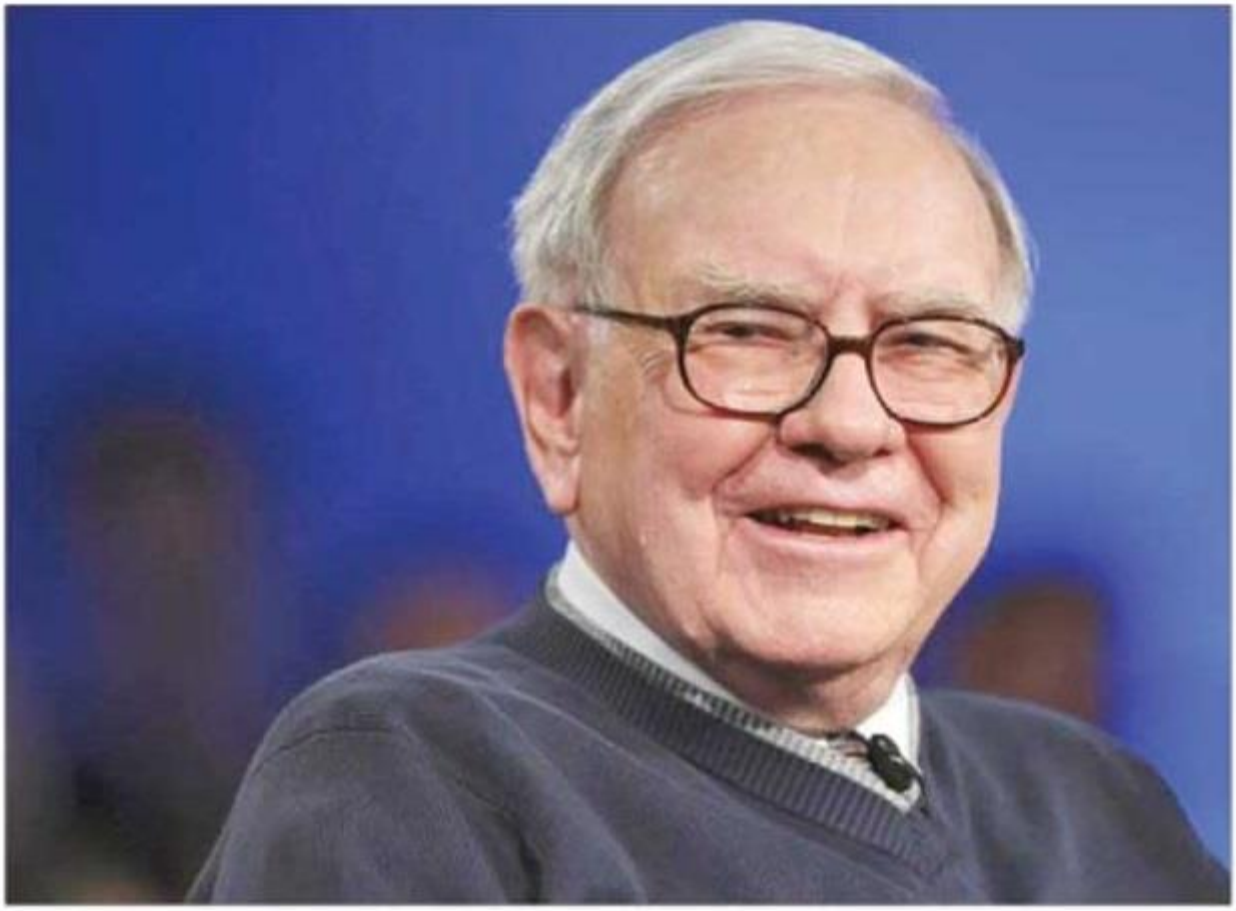

জোর দিয়ে বলুন— যে কেউ-ই ভুল করতে পারে

২০০৮ সালে মন্দা শুরুর পর ইউরোপ-আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি টিকতে না পেরে বাজার ছেড়েছে। এখনো খাবি খাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানও কম নয়। অথচ বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের দিকে তাকান। এটি সম্পদ বাড়িয়েই চলেছে এর মধ্যেও। বাফেটের এমন সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছেন বিশ্লেষকরা। এক দলের ধারণা, বাফেট খুবই সৌভাগ্যবান। আরেক দল মনে করে, তার রয়েছে বাজার বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা। বাফেট বলেন, এ দুটি সম্ভবত আংশিক সত্য। আমার হিসাব-নিকাশ কমবেশি নির্ভুল হওয়ার প্রকৃত কারণ মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতা নয়, বরং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ। এর প্রথম পাঠ হলো দ্রুত ও জোরালোভাবে ভুল স্বীকার।

সতর্ক থাকার পরও কয়েক বছর আগে এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন বাফেট। মন্দার শুরুতে আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতি মজবুতই ছিল। এ জন্য বাফেট ভেবেছিলেন, আইরিশ ব্যাংকে বিনিয়োগ করাটা বোধহয় নিরাপদ। এ চিন্তা থেকেই বিনিয়োগ করে বসলেন একাধিক আইরিশ ব্যাংকে। এর ক'মাস পর আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতিতে প্রকট হয়ে উঠল মন্দার লক্ষণ। ব্যাংকও বাদ গেল না এ থেকে। এতে বড় ধাক্কা খেল বার্কশায়ার; লোকসান হলো কয়েক শ মিলিয়ন ডলার। এমন পরিস্থিতিতে অনেক চেয়ারম্যানই ভুল

স্বীকার না করে হয় সেটি এড়িয়ে যান, নয়তো পদস্থ কর্মকর্তাদের চাকরি খেয়ে শেয়ারহোল্ডারদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। বাফেট এর কোনোটাই করলেন না। কারণ তার অন্যতম জীবন দর্শন— ভুল করলে স্বীকার করতে হবে আর সেটি করতে হবে দ্রুত ও জোরালোভাবে। তিনি খেয়াল করেছেন, কোনো ম্যানেজার বা সিইও যখন এসব করেন না, তিন রকম দৃশ্যপট সৃষ্টি হয় কর্মী ও শেয়ারহোল্ডারদের মনে। ভুল একেবারেই স্বীকার করা না হলে তারা ভাবে, ম্যানেজারের ইন্টিগ্রিটি (চারিত্রিক সংহতি) নেই; এ ব্যাটা নিশ্চয়ই হিসাবের খাতায় গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে, কোম্পানির টাকাপয়সা মেরে দেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আবার ভুল স্বীকারে দেরি করলে বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে ওঠে মানুষ। আর জোরালোভাবে সেটি স্বীকার করা না হলে ভাবে, এমন একজন কাপুরুষ আমার কোম্পানির ম্যানেজার! কারও কারও ধারণা— যেসব লোক কখনই ভুল করে না, মানুষ তাদের পছন্দ করে। বাফেট দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, এমন ধারণা ঠিক নয়। সিংহভাগ মানুষ চায়, পদস্থ কর্মকর্তারা যথাসম্ভব কম ভুল করুক আর স্বীকার করুক ভুলটি। একেবারেই ভুল না করলে ধরে নেয়— নিশ্চয়ই বড় রকমের ঘাপলা আছে এখানে। বার্কশায়ার তখন সবে শিশু। একবার বিনিয়োগ করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেললেন বাফেট। অন্য ম্যানেজারদের দেখাদেখি গোপনও করলেন সেটি। কিছুদিন পর তিনি লক্ষ করলেন, আগের চেয়ে অনেকটাই যেন কম শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে কর্মীরা। কেউ কেউ আগে তার কথা শুনে খুব অনুপ্রাণিত হতো; সেটিও দেখছেন না ইদানীং। সবচেয়ে বড় কথা, আগে যে ধরনের ইস্যুতে পদস্থ কর্মকর্তারা প্রশ্ন তুলত না; এখন তারা তর্ক করছে সেসব নিয়ে। বাফেট উপলব্ধি করলেন, এরা সবাই অনাস্থায় ভুগছে তার 'ম্যানেজেরিয়াল গাইডেন্স' নিয়ে। ফলে তার পরামর্শ যাচাই করে দেখছে নিজেরা। আর এসবের উৎসমূল হলো তার ভুল স্বীকার না করাটা। পরবর্তী সময়ে ছোট হোক বা বড়, দ্রুত ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে ভুল স্বীকার করে নিতেন বাফেট। বছর দশেক আগে তিনি বিরাট ভুল করে ফেলেন তেল কোম্পানি কনোকোফিলিপসে বিনিয়োগ করতে গিয়ে। জ্বালানি তেলের দাম তখন ছিল ব্যারেলপ্রতি ১৪০ ডলার। বাফেট ভেবেছিলেন, এটি আরও বাড়বে। ফলে বেশি দামে কিনে নেন কোম্পানিটির ১০ শতাংশেরও বেশি শেয়ার। বাস্তবে তার অনুমান ভুল প্রমাণ করে এর পরই কমতে থাকল তেলের দাম। তার কেনা শেয়ারের দামও গেল পড়ে। প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার লোকসান করলেন বাফেট। সঙ্গে সঙ্গে ভুলটি স্বীকার করলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন নিজেই। এতে বার্কশায়ারের শেয়ারহোল্ডার ও কর্মীদের উদ্দেশে বললেন— বিরাট ভুল করেছেন তিনি। এতে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছে। এ জন্য দায়ী তিনিই। কারণ সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন একা এবং এ স্পেকুলেশনে 'জাজমেন্টাল এরর' (বিচারিক ত্রুটি) হয়েছিল তার।

বাফেটের কথায় কিন্তু ক্ষোভ দেখায়নি বার্কশায়ার শেয়ারহোল্ডাররা। কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আন্দোলনে নামেনি। এ ঘটনায় বাফেটের ওপর আস্থা বরং আরও বেড়ে যায় তাদের। তারা অনুভব করেছিল, এত বড় ভুল হওয়ার পরও যিনি বলিষ্ঠভাবে তা স্বীকার করতে পারেন, তিনি আর যাই হোক— তাদের আমানত নিয়ে নয়-ছয় করবেন না। বাফেট বলেন, কেউ যদি স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েন, তিনি দেখতে পাবেন— সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেক রাজনীতিকই কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেননি কেবল দ্রুত ভুল স্বীকারে ব্যর্থ হওয়ায়।

ব্যাংকঋণ কখন নেবেন কখন নেবেন না

মুনাফা নেশার মতো। উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা নিজেকে 'রেসের ঘোড়া' ভাবতে শুরু করেন এতে আসক্ত হলে। অন্যদের ক্ষেত্রে কতটা হয় কে জানে, তবে বাফেট নাকি অনুভব করেন এমনটিই। সমস্যা হলো, মুনাফা অর্জনের পথটি মসৃণ নয়। এটি এবড়ো-থেবড়ো আর চোরাবালি-খানাখন্দে ভরা। তার পরও 'রেসের ঘোড়া'কে এ পথে হাঁটতে হয় মুনাফা অর্জনের নেশায়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত থাকুন, এক-দুবার হোঁচট খেলে এমনকি পড়ে গেলেও। তবে দুশ্চিন্তা হয়— পড়ে গিয়ে আর দাঁড়াতে না পারলে। এ অমসৃণ পথে গভীর চোরাবালি হলো ব্যাংকঋণ।

প্রায় সব ব্যবসায়ীই ভাবেন— একটু ঋণ নিই না, তাহলে ব্যবসাটা বাড়ত। আর সুদ-আসল? ওটি হয়ে যাবে। সবাই নিচ্ছে না? তারা তো ফেরতও দিচ্ছে। ব্যবসায় একটু 'কলা-কৌশল' অপরিহার্য বৈকি। বাফেট মনে করেন, এ ক্ষেত্রে ওস্তাদ হলো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে এগুলো নিত্য যেসব কৌশল বের করে, সেগুলো চমকপ্রদ বটে। তবে বাফেট লক্ষ করেছেন, মোটামুটি ২০ বছর পরপর অনেক দেশের ব্যাংকিং খাতই একটা করে ধাক্কা খায় ঋণ ব্যবস্থাপনায় ভারসাম্য হারিয়ে। ব্যাংকে মুনাফা অর্জনের সাধারণ কৌশল হলো— আমানতকারীদের কাছ থেকে স্বল্পমেয়াদি সঞ্চয় জমা রেখে সেটি দীর্ঘমেয়াদি গ্রহীতাকে দেয়া; অবশ্যই দুয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রেখে। সাধারণত

আমানতকারীর চেয়ে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা থাকে কম। আবার অনেক স্বল্পমেয়াদি হিসাব থেকে সঞ্চয় উঠিয়ে নেয়া হয় মধ্যমেয়াদে। এ দুই উপাদান সমন্বয়ের মাধ্যমে মুনাফা বাড়ায় ব্যাংক। মাঝে মধ্যে এমনও দেখা যায়, কোনো কারণে একসঙ্গে অনেক স্বল্পমেয়াদি আমানতকারী অর্থ ফেরত চাইছেন; অন্যদিকে মধ্যমেয়াদি ঋণ দেয়ার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না সেভাবে। ব্যাংক ভয়াবহ সমস্যায় পড়ে তখন। এটি ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে।

ব্যাংকঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে ম্যানেজারদের কেমন মানসিকতা কাজ করে? তারা ভাবেন অনেকটা এ রকম— অমুক ব্যবসা থেকে মুনাফা পাচ্ছি বছরে ৬ লাখ টাকা। অথচ তমুক ব্যবসা ধরা গেলে লাভ হতো ১৫ লাখ। সমস্যা হলো, কোটির মতো টাকা লেগে যাবে এটি করতে। কিন্তু ওই পরিমাণ নগদ টাকা আমার হাতে নেই। তাহলে কী করা? ব্যাংকঋণ নাও। ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকা নিলে বছরে সুদ দিতে হবে ১০ লাখ। মুনাফা ১৫ লাখ হলে সুদ পরিশোধের পরও ৫ লাখ টাকা হাতে থাকবে। আগেরটি মিলে মোট মুনাফা ১১ লাখ টাকা হবে তখন। চিন্তাটি এ পর্যন্ত ঠিক আছে। সমস্যা হলো, কী হবে— যদি এরই মধ্যে সামগ্রিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়? বাফেট বলেন, সে ক্ষেত্রে ব্যাংকঋণ প্রতিষ্ঠানটির দেউলিয়াত্বের কারণও হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসায়ীরা কি ঋণ নেবেন না তাহলে? অবশ্যই নেবেন; তবে অবস্থা বুঝে।

মন্দা বলে কোনো শব্দ নেই বাফেটের ডিকশনারিতে। তিনি বলেন— এটি (মন্দা) অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়। বুঝতে পারলে এটি তোমার জন্য সুযোগ, নইলে সর্বনাশ। এটি সম্ভবত যেকোনো দেশ ও কালের ক্ষেত্রেই সত্য। অনেক ম্যানেজারকে দেখা যায়, কোম্পানি টিকিয়ে রাখতে বেশি করে ব্যাংকঋণ নিচ্ছেন মন্দায়। বাফেট বলেন, আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে এটি। সফল হতে চাইলে মন্দাকালে ঋণ নেয়াই যাবে না। ঋণ নেবে (অবশ্যই সক্ষমতা বিচারপূর্বক) তখনই, যখন দেখবে অর্থনীতিতে মন্দা কেটে যাওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

চলতি বিশ্বমন্দায় বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কেবল টিকেই থাকেনি; মুনাফাও বাড়িয়েছে। অথচ মন্দা শুরুর সময় এটির উল্লেখযোগ্য ব্যাংকঋণ ছিল। আসলে বাফেট এ ঋণ নিয়েছিলেন বিনিয়োগ বাড়াতে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মন্দার লক্ষণ বুঝতে পারা মাত্রই তার সিংহভাগ ফেরত দিয়ে দেন বাফেট। তার দুশ্চিন্তা ছিল, ব্যাংক 'বেইল আউট' পেলেও পেতে পারে। কিন্তু তাকে বেইল আউট করবে কে? তার পরও সে সময় বার্কশায়ারের কাছে ছিল ২০ বিলিয়ন ডলারের মতো নগদ অর্থ। এটি দিয়েই তিনি পড়তিকালে শেয়ার কিনেছেন; আবার দাম উঠলে তা বেচেও দিয়েছেন। বাফেটের পরামর্শ— অর্থনীতিতে মন্দার ধাক্কা লাগামাত্র ম্যানেজারদের উচিত যথাসম্ভব ঋণভার লাঘব করা। তার পরও সমস্যা থেকে গেলে নেয়া যাবে না ঋণ। নজর দিতে হবে বরং উৎপাদন ব্যয় কমানোয়। এতে সাময়িকভাবে কিছু কর্মসংস্থান নষ্ট হবে। কষ্টকর হলেও এ ধরনের পদক্ষেপে কোম্পানিটি টিকে থাকার সুযোগ পাবে।

বই পড়া বাফেটের বড় শখ। তার আবার বেশি ভালো লাগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ইতিহাস এবং এ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়তে। ২০০৮ সালে মন্দা দেখা দিলে ত্রিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের মন্দা-সংক্রান্ত প্রচুর বইপত্র পড়া শুরু করেন বাফেট। তার জানা দরকার ছিল— ওই সময়ে কোন কোম্পানি টিকে ছিল? মন্দায়ও মুনাফা করেছিল কারা? দাঁড়াতেই পারেনি কোনগুলো? পড়তে পড়তে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, এসব মন্দায় শতাব্দী পেরুনো দুই প্রতিষ্ঠান কোকাকোলা ও ওয়েলস ফার্গো কেবল টিকেই থাকেনি, ব্যবসা বাড়িয়েছে। এর কারণও বের করে ফেললেন তিনি। দেখা গেল, মন্দা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে এদের একটি ব্যাংকঋণ ফেরত দিয়েছিল; অন্যটি কমিয়ে ফেলেছিল উৎপাদন ব্যয়। ঠিক এ শিক্ষাই বাফেট কাজে লাগান ২০০৮ সালের মন্দায়। এটি জানার পর কেউ কেউ তাকে বলেছেন, এসব পুরনো ট্রিকস। জবাবে বাফেট সহাস্যেই বলেন— 'সামটাইমস ওল্ড ডগস নো অল দ্য ট্রিকস'।

সতর্ক থাকতে হবে ভালো আইডিয়ার বিষয়ে

লন্ডনে জন্ম নেয়া বেঞ্জামিন গ্রাহাম মা-বাবার সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন মাত্র এক বছর বয়সে। অতিমাত্রায় চঞ্চল ও দুষ্টু প্রকৃতির ছিলেন তিনি। পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল না কৈশোরেও। দুটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এল আকস্মিকভাবে— বাবার মৃত্যুর পর। দারিদ্র্যের প্রকট রূপ দেখলেন তিনি। এতে কমে গেল চঞ্চলতা; পড়াশোনায় এল মনোযোগ। একটা পার্টটাইম চাকরিও জুটিয়ে নিলেন, যেন মায়ের ওপর আর্থিক চাপটা বেশি না পড়ে। এরই মধ্যে কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়ায় ভর্তি হলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, অর্থশাস্ত্রে। এখানে আসার পর তার আগ্রহ লক্ষ করা গেল গণিতশাস্ত্র, দর্শনেও। গ্রাহাম ২০ বছর বয়সে স্নাতক সম্পন্ন করেন 'স্যালুটেটরিয়ান' শিক্ষার্থী হিসেবে। স্যালুটেটরিয়ান হলো কোনো শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি (বর্তমান মার্কিন ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামাও একজন স্যালুটেটরিয়ান)। সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী প্রথম ব্যক্তিকে বলা হয় ভ্যালিডিক্টোরিয়ান। সমাবর্তনের সময় স্যালুটেটরিয়ান উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আর অনুষ্ঠান শেষ হয় ভ্যালিডিক্টোরিয়ানের বক্তব্যে। অসাধারণ একাডেমিক পারফরম্যান্সের জন্য গ্রাহামকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির তিন বিভাগ থেকে— গণিতবিদ্যা, দর্শন ও ইংরেজি পড়াতে। প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি গ্রাহাম।

প্রথমত, ভালো বেতনের আশায়; দ্বিতীয়ত, শেয়ারবাজার ইন্টারেস্টিং মনে হওয়ায় তিনি চলে আসেন ওয়ালস্ট্রিটে। খুলে বসেন 'গ্রাহাম-নিউম্যান পার্টনারশিপ'। এর কয়েক বছর পর ডেভিড ডডের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে লেখেন 'সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস'। শেয়ারবাজারের সিরিয়াস বিনিয়োগকারীদের জন্য অন্যতম পাঠ্য এ বইটি।

তরুণ ওয়ারেন বাফেট গ্রাহামের বড় ভক্ত ছিলেন। নিজেই বলেছেন, ওয়ালস্ট্রিটে তিনি গ্রাহামের কাছ থেকে যতটা শিখেছেন, তেমনটি অন্য কারও কাছে নয়। বাফেটকে প্রশ্ন করা হলো, গ্রাহামের কোন শিক্ষাটি আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? তিনি জানালেন, গ্রাহাম বলতেন— খারাপ আইডিয়ার চেয়েও মারাত্মক হতে পারে ভালো আইডিয়া। কারণ তুমি যদি বোঝ আইডিয়াটা ভালো নয়, সেটি নিয়ে আর এগোতে চাইবে না। শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে এটি। কিন্তু কোনো আইডিয়া যদি মনে ধরে যায় আর এতে হুঁশ হারিয়ে ফেলো; সতর্ক না থাক, তবে চরম বিপর্যয়ে পড়তে পার তুমি। অনেক ভালো আইডিয়াতেই থাকে লুক্কায়িত বিপদ— ঝলমলে কাগজে মোড়ানো প্যান্ডোরার বাক্সের মতো। এসব ক্ষেত্রে সতর্ক না থাকলেই বিপদে পড়বে। অথচ একটি ভালো আইডিয়া যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পার, সেটাই ইনস্টিটিউশন হয়ে দাঁড়াবে এক সময়।

২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট মন্দার বড় কারণ ছিল ইউএস হাউজিং বাবল বিস্ফোরণ ও মাল্টিন্যাশনাল বীমা কোম্পানি এআইজির (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ) দেউলিয়া হয়ে পড়া। দুটি ক্ষেত্রেই সর্বনাশ ডেকে আনে সাবপ্রাইম মর্টগেজ নামক ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। একটি কথা সবখানেই প্রচলিত। কেউ যদি ব্যাংক থেকে ৫০০ টাকা ঋণ পেতে চান, তাকে ১ হাজার টাকা পকেটে রাখতে হবে ব্যাংককে দেখানোর জন্য। তবেই ঋণ পাবেন; নইলে ব্যাংক ফিরেও তাকাবে না। অনেকেই রয়েছেন, যাদের অর্থকড়ি খুব একটা নেই; নেই ব্যাংককে দেখানোর মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও। তবে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয়া হলে তা করতে সক্ষম তারা। যুক্তরাষ্ট্রে এদের সংখ্যা বিপুল। এ কারণে গৃহপ্রতি সঞ্চয় চীনের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম আমেরিকায়। সাবপ্রাইম মর্টগেজ নীতি নেয়াই হয়েছিল তাদের সহজ শর্তে (কিন্তু চড়া সুদে) বাসগৃহ বানানোর ঋণ জোগাতে। এ ক্ষেত্রে টার্গেট জনগোষ্ঠী ছিল— যারা ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পান না, তারা। সাবপ্রাইম মর্টগেজের অন্যতম প্রবক্তা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হার্ভি রোজেন বলেন, যারা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 'যথেষ্ট' ঋণ পান, তাদের জন্য এটি নয় একেবারেই। সাবপ্রাইম মর্টগেজ কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও ভালো কৌশল ছিল। বহু মানুষ এতে কাজ পেয়েছিলেন মর্টগেজ ব্রোকার হিসেবে। কিন্তু একদিন ঘুম থেকে উঠে মার্কিনরা দেখল, শুরু হয়েছে মন্দা। অফিসে গিয়ে শুনল, চাকরি নেই। এভাবে অধিকাংশ আমেরিকান হারাল সাবপ্রাইম মর্টগেজের সুদ পরিশোধের ক্ষমতা। ইউএস হাউজিং বাবল বিস্ফোরণের প্রধান কারণ এটি। সতর্ক না থাকায় একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া দ্রুতই পরিণত হলো বিধ্বংসী আইডিয়ায়।

বীমা জায়ান্ট এআইজির ক্ষেত্রেও ঘটে একই ঘটনা। কোম্পানিটির অন্যতম ব্যবসা ছিল, তারা ইনভেস্টমেন্ট-গ্রেডেড করপোরেট বন্ডে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকির বিপরীতে বীমা দিত ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে। এআইজির অর্থনীতিবিদরা দেখেছিলেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক, বিশ্বজুড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার করপোরেট বন্ড ভেঙে টাকা তুলে নেয়া হবে— এমনটি ঘটার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। তার মানে, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের অর্থ সব ক্লায়েন্টকে একসঙ্গে দিতে হবে না এআইজিকে। এ পর্যন্ত আইডিয়াটা চমৎকারই। এ-ই করে কম ঝুঁকি নিয়ে এআইজি সহজেই জমিয়েছিল মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের প্রিমিয়াম। এ কোম্পানির অর্থনীতিবিদরা ভুল করলেন আইডিয়াটি আরও এগিয়ে নিতে গিয়ে। তাদের বিশ্লেষণ হলো, করপোরেট বন্ডে লিখিত বীমা করিয়েই যদি সহজে মুনাফা অর্জন করা যায়, সাবপ্রাইম মর্টগেজে কেন তা হবে না? সাবপ্রাইম মর্টগেজে লিখিত বীমা করা হলে তো আরও কমে যাবে ঝুঁকি। করপোরেট বন্ডের তুলনায় সাবপ্রাইম মর্টগেজে মুনাফা অনেক বেশি। তবে তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল, বহু প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর নির্ভরশীল। তারা সাবপ্রাইম মর্টগেজে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে চাইছে, সেটি ছোট অনেক দেশের বাজেটের সমান। কোনো কারণে এআইজি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে মুখ থুবড়ে পড়বে অনেক কোম্পানি। বাফেট মনে করেন, আইডিয়াটি ভালো হওয়ায় এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টাই ছিল না এআইজির নীতিনির্ধারকদের। মন্দা শুরু হলো ২০০৮ সালে। ২০০৯-এ সাবপ্রাইম মর্টগেজ খেলাপির সংখ্যা বাড়ল জোয়ারের মতো। এর এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল এআইজির মেরুদণ্ড। কোম্পানিটি দেউলিয়া হলো। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল এর ওপর নির্ভরশীল ইউরোপ-আমেরিকার অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অতঃপর মন্দা জেঁকে বসল ইউরো অঞ্চলে। এরই মধ্যে (মন্দার আগে) বিনিয়োগ বাড়াতে এআইজি ৮৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল ইউএস ট্রেজারি থেকে। এখন কোম্পানিটি দেউলিয়া হয়ে পড়ায় বাজেটে বাড়ল ঘাটতি। বাফেট উভয় বিপদ থেকেই বেঁচেছিলেন বেঞ্জামিন গ্রাহামের উপদেশ মেনে চলার কারণে। এজন্য তিনি অন্যদেরও পরামর্শ দেন, যাতে তারা খারাপটির চেয়ে ভালো আইডিয়ার বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকে।

দুর্নীতিপ্রবণ কর্মী সামলানোর উপায় কী

বন্ড ট্রেড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সলোমন ব্রাদার্স স্ক্যান্ডালের কথা অনেকে ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। সলোমন ব্রাদার্স ওয়াল স্ট্রিটের বিখ্যাত বিনিয়োগকারী ব্যাংক। বন্ড ট্রেডে তাদের সমকক্ষ পাওয়া কঠিন এখনো। আশির দশকে বাফেট এতে বিনিয়োগ করেন ৭০০ মিলিয়ন ডলার— পুরোটাই প্রেফারড স্টকে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য হয়ে যান তিনি। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠানটির দুই বন্ড ট্রেডিং শাখা একটি অপকর্ম করে বসে। মুনাফা দ্রুত বাড়ানোর আশায় বোর্ডকে কিছু না জানিয়ে তারা চেষ্টা চালাতে থাকে নির্ধারিত সীমার বাইরে ইউএস ট্রেজারি বন্ড কেনার। অপরাধীর বন্ধুর অভাব হয় না। তারা পেয়েও যায় ইউএস ট্রেজারির দু-তিনজন দুর্নীতিপ্রবণ কর্মকর্তার খোঁজ। এদের যোগসাজশে বন্ড কেনার জাল কাগজপত্র তৈরি করে সলোমন

ব্রাদার্সের ওই দুই ব্রোকার শাখা। তাদের সহায়তায় কিনেও ফেলে নতুন ইস্যু করা বিপুল ট্রেজারি বন্ড। সে সময় ইউএস ট্রেজারি বিভাগে বন্ড লেনদেনের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তার সন্দেহ হয় এত বন্ড কেনার ঘটনায়। তার মনে হয়েছিল, এমন লেনদেনে ট্রেজারি বিভাগের কারও হাত না থেকে পারে না। প্রথমে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি। এতে বেরিয়ে আসে ট্রেজারির দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের তালিকা। সঙ্গে সঙ্গে চাকরিচ্যুত করা হয় তাদের। এদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে নোটিস দেয় ইউএস ট্রেজারি। কমিশন ট্রেজারি বন্ড কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে সলোমন ব্রাদার্সের বক্তব্য জানতে চেয়ে চিঠি দেয়। তিন মাসেও এর কোনো জবাব অবশ্য দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি। ঘটনা জানানো হয় ট্রেজারি বিভাগকে। এবার তারা সরাসরি চিঠি ইস্যু করে সলোমন ব্রাদার্সের নামে। এরও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। ফলে ইউএস ট্রেজারি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বন্ধ করে দেয় সলোমন ব্রাদার্সের যাবতীয় কার্যক্রম। এদিকে দুই ব্রোকার শাখার বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন সলোমন ব্রাদার্সের তখনকার চেয়ারম্যান। ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি কোনো ব্যবস্থা নিলে যদি নিরপরাধ কারও ক্ষতি হয়ে যায়! তবে এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই ইউএস ট্রেজারি বন্ধ করে দেয় সলোমন ব্রাদার্সের লেনদেন। এটি দেখে বোর্ড অব ডিরেক্টরস তাকে অপসারণ করে নতুন চেয়ারম্যান বানায় ওয়ারেন বাফেটকে। দায়িত্ব নিয়ে বাফেট গড়বড় চিহ্নিত করার কোনো চেষ্টাই করলেন না। প্রথম দিনেই চাকরিচ্যুত করলেন অভিযুক্ত শাখার দুই ম্যানেজারকে। দ্বিতীয় দিন বিদায় করে দিলেন সলোমন ব্রাদার্সের সিইওকে। তাকে চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে বাফেট বোর্ডকে যুক্তি দেখালেন— যার নাকের ডগায় এত বড় কেলেঙ্কারি ঘটতে পারে, নিরপরাধ হলেও তার চাকরি থাকা উচিত নয়। চাকরিচ্যুতদের ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দেয়া হলো— আদালতে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, তবে সলোমন ব্রাদার্সে তাদের আর ঠাঁই হবে না। এর পরই সলোমন ব্রাদার্সে এসে বাফেট তদন্ত করতে আমন্ত্রণ জানান ইউএস ট্রেজারিকে। ব্যাংকটির সুরক্ষিত রেকর্ড ভল্টেও তাদের প্রবেশাধিকার দেয়া হয় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে। এ অ্যাপ্রোচে সন্তুষ্ট হয়ে ইউএস ট্রেজারি সলোমন ব্রাদার্সকে তার কার্যক্রম শুরুর অনুমতি দেয়। শেষ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় কোম্পানিটিকে জরিমানা গুনতে হয় প্রায় ২৯০ মিলিয়ন ডলার।

এ ঘটনার পর থেকে বাফেট বার্ষিক মিটিংশেষে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ম্যানেজার-সিইওদের বলতেন, কারও যদি অতিরিক্ত মুনাফা করাটা 'জরুরি' হয়ে পড়ে কিংবা কেউ যদি 'স্বভাবত'ই আগ্রাসী হন, বার্কশায়ারে থাকাকালে তাদের কাজটি করতে হবে আইনের ভেতরে থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন— টেবিলের মাঝেই অধিকাংশ টাকাকড়ি থাকে, আনাচে-কানাচে তা খোঁজার দরকার কী? তাই দুর্নীতিপ্রবণ কর্মীদের প্রতি তার সতর্কবার্তা ছিল— কোনো অপকর্ম ঘটিয়ে ফেললে প্রথমেই বিভাগীয় তদন্ত হবে না; বরং তুলে দেয়া হবে আইনের হাতে। কারণ পরিচালনা পর্ষদের চেয়েও শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বেশি দায়বদ্ধ বার্কশায়ার। আর ম্যানেজারদের জন্য বাফেটের পরামর্শ ছিল— তারা যেন কর্মীদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, দুর্নীতিপ্রবণ কর্মীর উচ্চাভিলাষ যাতে প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ ডেকে না আনে। এ প্রসঙ্গেই বাফেট বলতেন, এ ধরনের শিক্ষা কেউ হাতেকলমে (ধরা খেয়ে) নিতে চায় না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস, অধিকাংশ মানুষ শিক্ষাটি গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর।

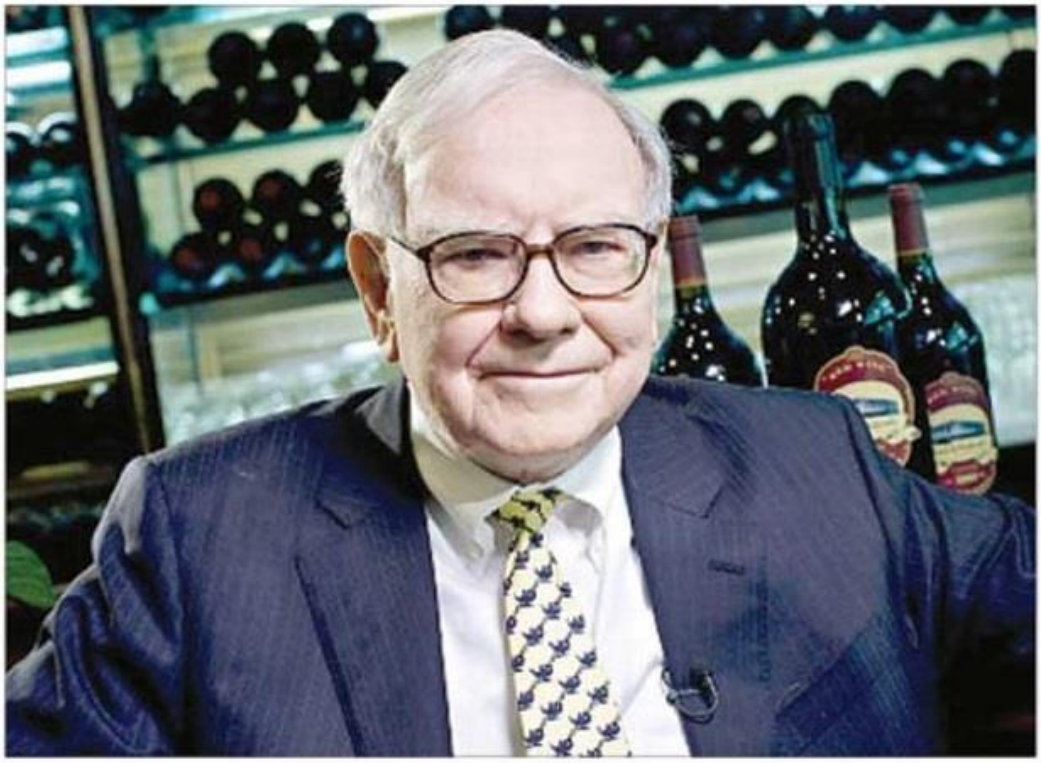

ভুল তো আমাদের অতীতের অংশ

বাফেট বলেন, বিনিয়োগে সাফল্য দেখে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, আমার জীবনে বোধহয় কোনো ভুল হয়নি। অথচ এ পর্যন্ত প্রচুর ভুল করেছি আমি। সামনে আরও ভুল করব, এটাও মেনে নিয়েছি। এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। ভুল মানুষের জীবনেরই অংশ। আমি শুধু খেয়াল রাখি, ভুলের তুলনায় সঠিক সিদ্ধান্তের সংখ্যা যেন বেশি হয়। কারণ আমার কাছে মানুষের সাফল্য = সঠিক সিদ্ধান্ত — ভুল; আর ব্যর্থতা = ভুল — সঠিক সিদ্ধান্ত। সঠিক সিদ্ধান্তের তুলনায় ভুল বেড়ে গেলে মানুষ নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে শুরু করে। আর জীবনে ভুল কমানোর উপায় হলো, ভুল নিয়ে পড়ে না থেকে, সেটি নিয়ে মন খারাপ না করে এগুলোকে শুধুই জীবনের ছোট ও গুরুত্বপূর্ণ নোট হিসেবে মস্তিষ্কে টুকে রাখা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে বাফেট ক্লাসে কখনো শিক্ষকের কথায় সায় দিয়ে হাত তুলতেন না, পাছে কিছু বলতে হয়। অনেক মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে, বিশেষত যখন দেখতেন সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে— জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ত। গুছিয়ে কথা বলতে না পারায় শৈশব ও কৈশোরে তার বন্ধুসংখ্যা ছিল একেবারেই সীমিত। অপরিচিতরা তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হতো না। তবে এ দুর্বলতাটি বাফেট এতটাই অতিক্রম করেছিলেন যে, পরে তার কথা শুনতে মানুষ অন্য দেশ থেকেও আসত বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের বার্ষিক সভায়। অন্যান্য কোম্পানির মতো এটিও হতে পারত নিষ্প্রাণ-বিরক্তিকর। সেটি যে হয়নি, তার কারণ এতে বাফেট প্রতিবারই শোনাতেন নতুন কথা; সহজ করে, তবে গভীরভাবে আলোকপাত করতেন ব্যবসার বিচিত্র দিক। ২০০৯ সালে ওমাহায় বার্কশায়ারের বার্ষিক সভায় যোগ দেয় ৪০ হাজার মানুষ। এতে বাফেট বলছিলেন বিনিয়োগে (ওই পর্যন্ত) তার বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের কথা। তিনি বললেন, পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করায় কনোকোফিলিপসে বিনিয়োগ করে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার লোকসান করেন। ইউএস এয়ার নামেও এক কোম্পানির বিপুল শেয়ার কিনেছিলেন তিনি। এটি নিরাশ করে তাকে। লাভজনক করতে পারবেন ভেবে কেনেন ব্লু চিপ স্ট্যাম্পস নামের এক ডুবন্ত কোম্পানি। এতেও কয়েক বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতির শিকার হন বাফেট। পরে চিন্তা করে দেখেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিল মূলত দুটি কারণে। এক, পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেননি; দুই, টাইমিংয়ে ভুল করেছিলেন। এ দুই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে পরে বাফেট বিনিয়োগ করেন ক্যাপিটাল সিটিজ

ব্রডকাস্টিংয়ে। আর এখান থেকে লাভ করেই পুষিয়ে নেন আগের তিনটি ভুলের ক্ষতি। ওই সভায় বাফেট স্বীকার করলেন ম্যানেজার-সিইও নিয়োগে তার একাধিক ভুলের কথা। প্রথমেই বলেন, এক সময় নিজেই বার্কশায়ারের ম্যানেজার হতে চেয়েছিলেন; যেটি ছিল 'ভুল আইডিয়া'। ডেম্পস্টারের বেলায় কয়েকবার ভুলের পর সঠিক ম্যানেজার খুঁজে পান তিনি। তবে এসব কথা একটা উদ্দেশ্যেই তিনি সবাইকে বলছিলেন, যাতে কেউ ভুল করে নিরাশ না হয়; ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তার মতো করে 'উইনিং টিম' গড়ে তুলতে পারে।

খেলতে না পারলেও বেসবল বাফেটের প্রিয় খেলার একটি। তার কাছে প্রতিটি নতুন বিনিয়োগই আবার বেসবলে নতুন পিচড (ক্রিকেটে বোলিংয়ের সঙ্গে তুল্য) বলের মতো। বাফেট বলেন, অনেক বল আমরা ছেড়ে দেই; কয়েকটিতে পরাস্ত হই আর কিছু পাঠিয়ে দিই বাউন্ডারির বাইরে। এখন কেউ যদি অধিকাংশ বলই বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে চায়, তাকে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কিছু বল কেন সে খেলতেই পারছে না। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী বলগুলো মোকাবেলা করতে হবে। এখন একটি বল খেলতে না পেরে কেউ যদি ভাবে, তার বেসবলই ছেড়ে দেয়া উচিত— সেটি নিজের কাছেও হাস্যকর মনে হবে এক সময়। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনের বেসবলে প্যাভিলিয়নে যাওয়া যায় একবারই। তার আগে মোকাবেলা করতে হয় অসংখ্য বল। যদি চান এ ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে বসে থাকতে— অভিযুক্ত করবে না কেউ। তবে সবাই খুশি হবে, যদি ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেন।

বাফেট মনে করেন, এ খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবই অন্য অনেক ব্যবসায়ী থেকে আলাদা করে রেখেছে তাকে। বাজারে বাড়তি সুবিধাও তিনি উপভোগ করছেন এ জন্যই। বাফেট বার্কশায়ারের ম্যানেজারদের মাঝে মধ্যেই পরামর্শ দেন— ভুল থেকে শিক্ষা নাও; ভুল নিয়ে পড়ে থেক না। যারা ভুল নিয়ে পড়ে থাকে, অযথা সময় ও শক্তি নষ্ট করে তারা। আক্ষেপের চেয়ে নতুনভাবে এগোনো কি ভালো নয়? ভুল তো আমাদের অতীতের অংশ। এ নিয়ে টানাটানিরই বা কী দরকার? সেগুলো শুধু স্মরণ করবে, যাতে ভবিষ্যতে একই ফাঁদে না পড়তে হয়।

প্রতিষ্ঠানে ‘ইয়েসম্যানের’ বদলে চাই ‘নোম্যান’

মন্ত্রীসহ খোদ পারিষদবর্গই তাকে সদুপদেশ দিচ্ছে না বলে সন্দেহ জাগল এক রাজার মনে। সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের সততা পরীক্ষা করবেন। একদিন জামাকাপড় ছাড়াই যাবেন রাজসভায়। দেখবেন তার কোপানলে পড়তে পারে জেনেও কেউ রূঢ় সত্যটা বলে কি না। যারা সত্য বলবে, বোঝা যাবে তারা সৎ তথা রাজার ভালোর জন্য অপ্রিয় পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠিত নয়। আর যারা রাজার জামাকাপড় আছে কি নেই, সেটি দেখেও না দেখার ভান করবে তথা বিষয়টি গোপন করতে চাইবে—তারা তোষামোদকারী। সদুপদেশ দেয়ার চেয়ে তাদের মেধা বেশি ব্যয় হয়, রাজা শুনতে পছন্দ করেন, এমন বাক্য ও শব্দগুচ্ছ অনুসন্ধানে। এমন পরিস্থিতিতেও গল্পের নায়ক রাজাকে দ্বিধাহীন কিন্তু ভদ্রভাবে বলেন, রাজার গায়ে তিনি পোশাক দেখতে পাচ্ছেন না; হয় এটি তার দেখার ভুল, নয়তো রাজাই ভুলে গেছেন জামাকাপড় পরতে। এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা নাকি পুরস্কৃতও করেছিলেন তাকে। বাফেট বলেন, গল্পের বাইরে এ ধরনের অপ্রিয় সত্য বলা মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ যুগের সিইও-ম্যানেজারদের আশপাশে নির্জলা সত্য বলা লোক আরও কম। তার কারণ কী? বাফেটের মতে, নেতারা (সিইও-ম্যানেজার যে-ই হোক) স্বভাবতই চায় মানুষের ভালোবাসা পেতে। সমস্যা হলো, কষ্ট করে ভালোবাসা অর্জন করতে চায় না অধিকাংশ নেতা। ফলে তারা আশপাশ ভরে রাখে ‘ইয়েসম্যান’ (হ্যাঁ বলা মানুষ) দিয়ে। এরা জীবিকা নির্বাহ করে অসত্য বিষয়েও বসের প্রশংসা করে। সুযোগ পেলেই বলে বসের মতো লোক হয় না। বসের আইডিয়া ঠিকমতো না শুনেই বলে অসাধারণ কিংবা দারুণ! ইয়েসম্যানরা কেন সত্য বলে না?

কারণ একটাই, এটাই তো তাদের চাকরি। মোটা বেতন দিয়ে এদের রাখাই হয় বসের বলা বাক্যের সঙ্গে ‘ইয়েস’ শব্দটা জুড়ে দিতে। ইয়েসম্যান রয়েছে সব ব্যবসায়ই। তারা অফিসে হাঁটে বীরদর্পে। তাদের দুটি বড় কাজ হলো, বসকে শোষণ ও তোষামোদী করতে গিয়ে সত্য পুনরাবিষ্কার করা। এ ধরনের মানুষ কিন্তু সহজেই চাকরি পায় কোম্পানিতে। ধরুন, প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। যাদের ‘নো’ বলার অভ্যাস আছে, তাদের দেবেন এ পদে চাকরি? প্রথমেই হবু উপদেষ্টার যে গুণ দেখতে চাইবেন, তা হলো তিনি আপনার বক্তব্যে সায় দেন কি না। অধিকাংশ সিইও-ম্যানেজারই কিন্তু চাকরি দিতে চায় না ‘নো’ বলাদের।

এখন প্রশ্ন তুলতে পারেন, সিইও-ম্যানেজারদের

আশপাশে ইয়েসম্যানরা থাকবে, তাতে সমস্যা কোথায়? বাফেট বলেন, কোনোই সমস্যা নেই; অবশ্য চূড়ান্ত ক্ষতি হওয়ার আগ পর্যন্ত। ওয়াল স্ট্রিটে এমন ঘটনা অনেক দেখেছেন তিনি। হয়তো বস একটি মধ্যম মানের আইডিয়া শোনাচ্ছেন; তা ভালোমতো না শুনেই 'ওঁয়াও, ওঁয়াও' করছে ইয়েসম্যানরা। হয়তো বলছে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার এমন আইডিয়া কোনো নোবেল বিজয়ীর মাথা থেকেও বের হবে না! দেখা গেল একদিন ওই আইডিয়াটাই আকাশ ভেঙে ফেলে দিয়েছে সিইওর মাথায়; কোম্পানি দেউলিয়া; বোর্ড অব ডিরেক্টরস সিইওকে নোটিস দিয়েছে পদত্যাগ করতে। আর ইয়েসম্যানরা তখন আরেকজন বস খুঁজছে, যাকে নতুন করে তোষণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। এমনিতেই বেশি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে স্বস্তি বোধ করেন না বাফেট। ওয়াল স্ট্রিটে এসব ঘটনা দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, মাত্র কয়েকজনের সঙ্গেই মিশবেন; আশপাশে যতটা সম্ভব কম ইয়েসম্যান রাখবেন; নোম্যানের সংখ্যা বাড়াবেন। সমস্যা সৃষ্টি হলে বোর্ড মিটিং ডেকে পরামর্শ করবেন সবার সঙ্গে।

নয়তো আলাপ করে নেবেন বার্কশায়ারের ভাইস চেয়ারম্যান চার্লি মানজারের সঙ্গে। ভদ্রলোক বাফেটের সঙ্গেই বড় হয়েছেন ওমাহায়। মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে ঝরে পড়ার পর নতুন করে পড়াশোনা শুরু করেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ল-এ। এখানেই জুরিসপ্রুডেন্সে ডক্টরেট করেন তিনি; পরে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়েতে যুক্ত হন। মানজারের একটি গুণ খুবই পছন্দ করেন বাফেট। সেটি হলো কথায় কথায় 'নো' বলেন তিনি। বাফেট নাকি আঙুল গুনে বলতে পারবেন, জীবনে কয়বার 'ইয়েস' বলেছেন মানজার। রসিকতা করে বাফেট বলেন, তিনি ভয়ে ছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানেও মানজার পাদ্রিকে 'নো' বলে বসেন কি না। শুরুতে অবশ্য এ কারণেই বন্ধু মানজারের ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন বাফেট। পরে চিন্তা করে দেখলেন, মানজার 'নো' বলাতেই বড় বিপদ থেকে তিনি বেঁচে গেছেন কয়েকবার।

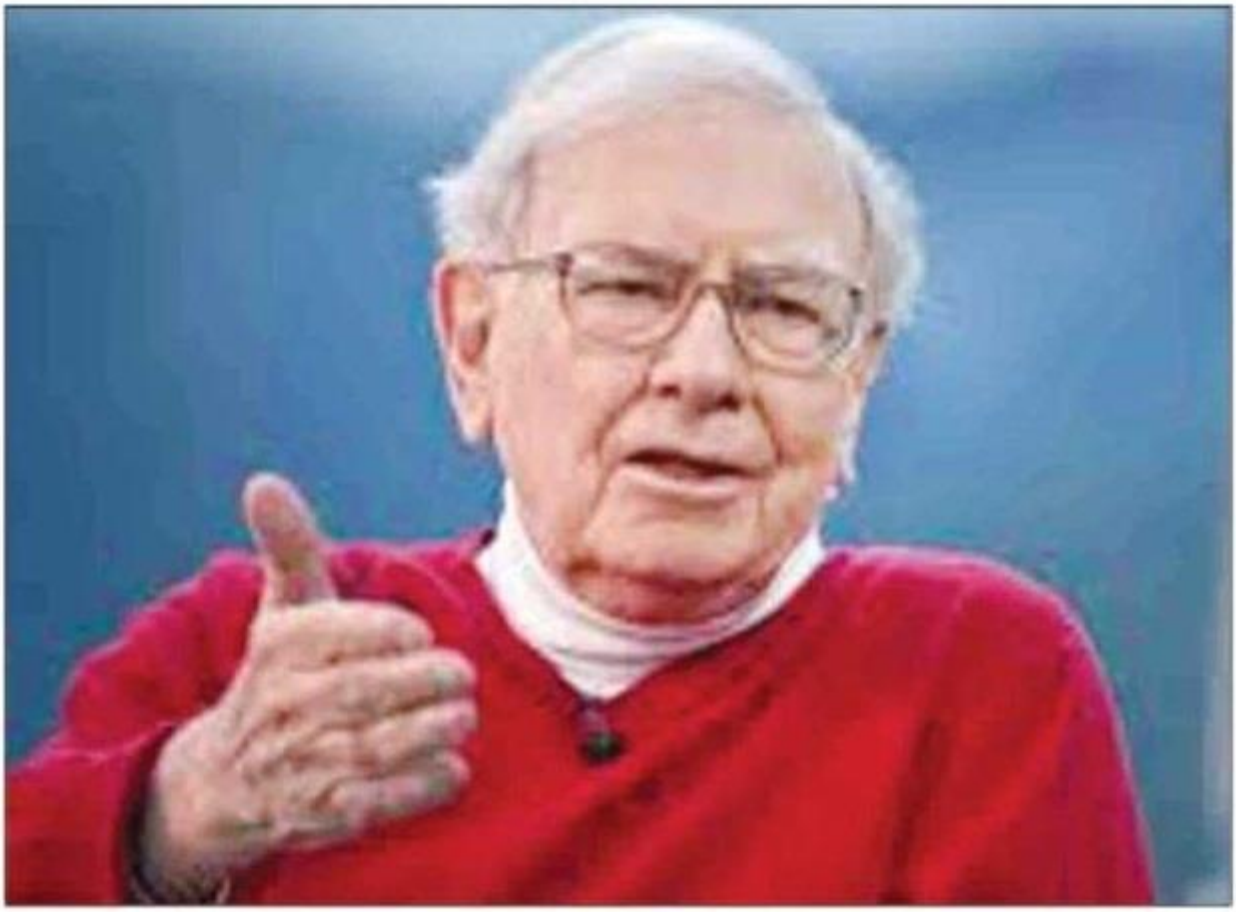

হাতছাড়া হওয়া সুযোগ থেকে শিক্ষা নিন

সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে সবচেয়ে দক্ষ ম্যানেজারেরও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঘটে যায় ম্যানেজারের অজান্তেই। এ বিষয়কেও বাফেট তুলনা করেন বেসবল খেলার সঙ্গে। তিনি লক্ষ করেছেন, কিছু কিছু বল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে ব্যাটসম্যান; যেগুলো থেকে কোনো পয়েন্টই (ক্রিকেটে রানের সঙ্গে তুলনীয়) আসে না। বাফেটের পর্যবেক্ষণ—ব্যাটসম্যানরা এমনটি করে সাধারণত দুটি কারণে। এক. বলটি নাগালের বাইরে দিয়ে গেলে অর্থাৎ 'ওয়াইড' (কার্যত ক্রিকেটের ওয়াইড বলের মতো হলেও এ ক্ষেত্রে নিয়মের পার্থক্য রয়েছে) হলে। দুই. নাগালে এলেও ব্যাটসম্যান রক্ষণাত্মকভাবে খেলতে পারে—যদি তার আশঙ্কা হয়, বলটি খেললে আউট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা এ থেকে কোনো পয়েন্ট আসবে না। বাফেট বলেন, এটি বিনিয়োগেও ঘটে। সুযোগই বুঝতে পারে না অর্থাৎ ওয়াইড বল খেলে না অনেক বিনিয়োগকারী। আবার কেউ কেউ চিন্তা করে, অমুক খাতে বিনিয়োগ করব, যদি মার খেয়ে যাই? কিংবা মুনাফা যদি না হয়? ভালোভাবে না বুঝতে পারায় এরা বিনিয়োগের নিরাপত্তা চিন্তায় রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে ঠেকিয়ে দেয় অনেক সম্ভাবনাময় বিনিয়োগও।

তিনি বলেন, যেসব সুযোগ বিনিয়োগকারীর রাডারে ধরা পড়ে না (ওয়াইড বল) সেগুলো খেলতে হবে কিছুটা এগিয়ে, নয়তো পিছিয়ে। তার মানে, এ ক্ষেত্রে খোঁজার পরিধি

বাড়াতে হবে। ব্যবসার বিভিন্ন দিগন্তে খুঁজে বের করতে হবে নতুন নতুন সম্ভাবনা। বাফেটের মতে, তাদের যুগে এটি করা কষ্টসাধ্যই ছিল। এখন তো ইন্টারনেটের যুগ। ফলে সম্ভাবনাময় ব্যবসা খুঁজে বের করা কঠিন নয় মোটেই। তার ওপর এ প্রতিযোগিতার বাজারে বিজনেস ব্রোকাররা মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেয় নিয়মিতভাবে। বিনিয়োগ ব্যাংকগুলোও তাদের নিত্যনতুন ফিচার নিয়ে প্রচারণা চালায় হামেশা। এগুলো থেকে এমন 'ওয়াইড বল' হিট করা কঠিন কিছু নয়, যেটি বাউন্ডারির বাইরে পাঠানো যায়।

বাফেট মনে করেন, নাগালে পেয়েও বিনিয়োগকারীরা কিছু সুযোগ কাজে লাগায় না। কারণ সে বুঝতে পারে না— সেটি আসলেই সুযোগ, না ছদ্মবেশী বিপদ। এটি ঘটে সুযোগটির ঝুঁকি ও মুনাফা যথার্থভাবে নিরূপণ করতে না পারায়। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মানুষের মস্তিষ্ক ওই বিষয়ে যত তথ্য তার জানা আছে, সবগুলো জড়ো করে। এরপর সেগুলো বিশ্লেষণ করেই নেয়া হয় সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বেশি গুরুত্ব দেয় সবশেষে প্রাপ্ত তথ্যকে। কী হবে যদি আমাদের সর্বশেষ জানা তথ্যটিই থাকে ভুল বা অসম্পূর্ণ? সহজেই অনুমেয়, সে ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে না। এমন পরিস্থিতি এড়ানোর উপায় হলো, জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলা; প্রাপ্ত সুযোগের ঝুঁকি ও মুনাফার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়া। এ ক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে ছোট-বড় বিনিয়োগ ভেদে। ধরা যাক, কোনো মুদি দোকানদার মনে করছে— বেভারেজ কোম্পানির ডিলারশিপ তার জন্য একটি সুযোগ। এটি লুফে নেয়ায় তার সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যদি ইলেকট্রনিকসের ব্যবসা তার কাছে বড় সুযোগ বলে মনে হয়? সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে কি সিদ্ধান্তটির যৌক্তিকতা নিরূপণ সম্ভব? কিংবা বড় মাপের কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ডিলার যদি চায় জ্বালানি তেলের ব্যবসায় নামতে? ওই ভদ্রলোককে কী করতে হবে তাহলে? প্রথমে মূল ব্যবসা দেখাশোনা ছেড়ে দিতে হবে কয়েক বছরের জন্য। ভর্তি হতে হবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিজসম্পদ বিভাগে। তার পর সে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, জ্বালানি তেলের ব্যবসা তার জন্য ভালো কি না। বাফেট এটিকে কেবল অবাস্তবই মনে করেন না; তিনি বলেন, এটি সময় ও শ্রমের অপচয়। এমন পরিস্থিতিতে তার সহজ সমাধান হলো, এমন ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত নিতে দাও— যারা বিষয়টি ভালোভাবে বোঝে; যার এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রয়েছে। এ কারণেই বাফেট বার্কশায়েরের ম্যানেজারদের বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা দেন। তার যুক্তি হলো, এরা বিষয়টি আমার চেয়ে ভালো বোঝে।

সুযোগ হাতছাড়া হলে কার না হয় আক্ষেপ? বাফেটেরও হয়। তিনি অফিসে এসে পত্রিকা খুলে শেয়ার পাতাটা দেখেন আগে। আর যখনই দেখেন ওয়ালমার্ট কিংবা ওয়াল গ্রিনের শেয়ারের দাম বাড়ছে; আফসোসের সুরে বলেন, হিসাবে এমন ভুল তিনি কীভাবে করলেন? আজ যদি ওয়ালমার্টে তার দ্বিগুণ শেয়ার থাকত; হয়তো বা এটি হতো বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের একটি অধিভুক্ত কোম্পানি। সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে বুঝলে বাফেট তাৎক্ষণিকভাবে চুপ হয়ে যান। একা একা চিন্তা করেন কিছুক্ষণ। তারপর কাগজপত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসেন— ভুলটা হলো কোথায়? তিনি বিশ্বাস করেন, হাতছাড়া হওয়া সুযোগের পুনর্মূল্যায়ন ভবিষ্যতে আরও বড় সুযোগ এনে দেয় মানুষকে।

মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সে নিজে

বাফেট বলেন, আমি নিজেকে একটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র, ব্যবসা তথা অর্থনৈতিক স্বত্বা বলে ভাবি। অনেকের কাছেই বিষয়টি হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু যখন চিন্তা করি আমি একটি ব্যবসা, অসীম উপার্জনের ক্ষেত্র— নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ মনে হয় না কোনো কিছুকেই। এ কারণে অনেক ব্যবসায়ীর মতো রাতে ঘুমের সমস্যা হয় না আমার। কোনো দিন যদি ঘুম থেকে উঠে দেখি, ওয়ারেন বাফেট কপর্দকশূন্য— অসহায় মনে হবে না নিজেকে। কারণ আমি তো আছি!

বাফেট মনে করেন, শৈশব হলো ওই সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময় মানুষ থাকে অনভিজ্ঞ ও শিক্ষা-দীক্ষাহীন। তার মানে, সেটি উপার্জনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়নি তখনো। শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেবল বেড়ে ওঠে আমাদের সম্পদ মূল্য তথা অ্যাসেট ভ্যালু। তখন দেখা দেয় উপার্জনের সম্ভাবনাও। বাফেট বিশ্বাস করেন, মানুষের অর্থনৈতিক স্বত্বা বিকাশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অপরিহার্য। কথাটি হিসাবরক্ষক, আইনজীবী ও রকস্টার সবার বেলায়ই প্রযোজ্য। অধিকাংশ মানুষ জীবন শুরু করে শূন্য পয়েন্ট থেকে। এরপর তাকে নিজে নিজে বাড়াতে হয় পয়েন্ট তথা মূল্য। কেউ কেউ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায় অবশ্য— যারা পায় উচ্চশিক্ষিত ও ধনাঢ্য অভিভাবক। সে ক্ষেত্রে তার খাতায় কিছু পয়েন্ট যোগ করে দেয় অভিভাবকরাই। একটি-দুটি বড় সুযোগের জানালাও খুলে দেয় তারা। তবে বাফেট মনে করেন, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও কারও নিজের যোগ্যতা, উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি না থাকলে বাবা-মামা-চাচার জোরে বেশি দূর যেতে পারবে না সে। হয় একটি নির্দিষ্ট স্তরে গিয়ে আটকে থাকবে; নয়তো যে অবস্থানে ছিল, সেখান থেকে পড়ে যাবে নিচে। এমন দর্শনের প্রয়োগ বাফেট সফলভাবে ঘটিয়েছেন তার সন্তানদের ক্ষেত্রে।

ব্যবসায়ীরা কামনা করে, বিনিয়োগ থেকে মুনাফা আসুক; ব্যবসা-বাণিজ্য থাকুক ঝুঁকিমুক্ত। বাফেটও তা-ই চান। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক স্বত্বা ঝুঁকিমুক্ত রাখতে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর দিতে হবে। এর মানে এই নয় যে, সাজসজ্জা বাড়াতে হবে; এর অর্থ দেহ ও মনকে সুস্থ রাখা। আর মুনাফা বাড়াতে জোর দিতে হবে সুশিক্ষায়। কাজ দুটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে উপার্জন সম্ভাবনা ও সক্ষমতা বেড়ে যাবে; সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকেও সুরক্ষিত থাকব আমরা। শিক্ষায় ফোকাস রাখতে হবে বিশেষায়িত জ্ঞানের ওপর। এতে বাজারে প্রতিযোগীর সংখ্যা কম থাকবে। আমরা পাব বিশেষ সুবিধা আর তাতে অনেকটা ইচ্ছামতোই নিজেদের জোগানো সেবার মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

ওয়ারেন বাফেটকেও এ দর্শনের ভিত্তিতে বড় করেছিলেন তার বাবা হাওয়ার্ড বাফেট। শৈশবে তিনি দেখতেন বাবাকে ওয়াল স্ট্রিটে যেতে। হাওয়ার্ড অনেক সময়ই খালি হাতে বেরিয়ে যেতেন। রাতে ফিরতেন শেয়ারের একগাদা কাগজপত্র নিয়ে। মাঝে মধ্যে তাদের জন্য খাবার ও খেলনা নিয়ে আসতেন বাবা। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাফেট— বাবা কী করেন? মায়ের উত্তর ছিল, ইনভেস্টমেন্ট। বাফেটও হতে চেয়েছেন তা-ই। ফলে স্কুলের

খাতায় বড় করে লিখেছিলেন, 'ওয়ারেন বাফেট : ফিউচার ইনভেস্টর'। সাত-আট বছর বয়সে বাফেট জেদ ধরেন, তিনি বিনিয়োগকারী হবেনই। হাওয়ার্ড তাকে পরামর্শ দেন, বড় বিনিয়োগকারী হতে চাইলে তুমি নিজেকে একটি ব্যবসা ভাবতে শেখ; নিজের সম্পদ মূল্য বাড়িয়ে তোল। এ লক্ষ্যেই বাফেট প্রথম চাকরি নেন তার দাদার দোকানে; সপ্তাহে ৫ ডলার বেতনে— সেলসম্যান হিসেবে। এক বছর চাকরির পর জমানো ডলার দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট থেকে কেনেন সিটিজ সার্ভিস কোম্পানির ছয়টি শেয়ার। তিনটি রাখেন নিজের জন্য; তিন বোনকে দেন বাকি তিনটি। এগুলো কয়েক মাস পর বেচে আরও শেয়ার কেনেন তিনি। এরই মধ্যে বাবার (হাওয়ার্ড তখন কংগ্রেসম্যান) উৎসাহে ও আত্মসম্পদ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাফেট শুরু করেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুইংগাম, পত্রিকা, কোকাকোলা বিক্রি। পাড়ার সেলুনে 'পোকার' খেলার যন্ত্রও বসান একটি। এতে ভালোই পয়সাকড়ি আসত বাফেটের। তার নামে স্থানীয় একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্টও খুলে দেন হাওয়ার্ড। একদিন ব্যাংক থেকে নোটিস এল— ওয়ারেন বাফেটের অনেক ডলার জমেছে; তাকে এখন আয়কর দিতে হবে। বাফেটের বয়স তখন ১৪। অনেকেই বলছিলেন, এটুকু বাচ্চা কী আয়কর দেবে! কিন্তু হাওয়ার্ড বললেন, ওয়ারেন কর দেবে; এখন থেকেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখতে হবে তাকে। অবশ্য বাফেটের বয়স বিবেচনায় ও বাবা কংগ্রেসম্যান হওয়ায় স্থানীয় আয়কর বিভাগ তাকে ৩৫ ডলার ফেরত দেয়। এ অর্থ দিয়ে একটি বাইসাইকেল কিনেছিলেন বাফেট; যেটি তিনি ব্যবহার করেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও।

হাওয়ার্ডই ছেলে ওয়ারেন বাফেটকে শিখিয়েছিলেন, প্রত্যেক মানুষ অসীম সম্ভাবনাময় একেকটি অর্থনৈতিক স্বত্ব; দুর্দিনে এটিই হলো তার বিশ্বস্ত অবলম্বন।

নতুন আইডিয়া নিয়েই নামতে হবে কেন?

ম্যানেজার, বিশেষত তরুণদের একটি মারাত্মক ভুল প্রায়ই করতে দেখা যায়। এদের ঝোঁক থাকে নিজস্ব ভাবনা (তাদের ভাষায় 'অরিজিনাল আইডিয়া') খোঁজার দিকে। তারা মনেই করে, এ বাজারে নিজস্ব ভাবনা না থাকলে উন্নতি করা কঠিন। নিজস্ব ভাবনাটি আবার হতে হবে একেবারেই স্বতন্ত্র, যাতে তা আর কারও চিন্তার সঙ্গে মিলে না যায়। এই করতে গিয়ে তারা এমন সব আইডিয়া বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লাগে, যেগুলো তার ক্যারিয়ারের ক্ষতি করে; বিপদে ফেলে দেয় প্রতিষ্ঠানকেও।

ওয়ারেন বাফেট বলেন, ব্যবসায় 'অরিজিনাল আইডিয়া'র খুব একটা প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে বরং দরকার এমন সব প্রমাণিত আইডিয়া, যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে টিকে রয়েছে সফলতার সঙ্গে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এ ধরনের আইডিয়া ভালোভাবে বুঝতে পারলে এতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। প্রশ্ন হলো, এমন আইডিয়া কোথায় মিলবে? বাফেট কিন্তু একটি উপায়ে খুঁজে বের করেন এ ধরনের আইডিয়া। প্রথমে তিনি ব্যবসায় সফল কোম্পানিগুলোর পুরো ইতিহাস পড়েন। পড়ে চিহ্নিত করেন প্রতিষ্ঠানটির সবল দিকগুলো। তারপর নোট লেখেন— এটি করা উচিত। এরপর ঘাঁটেন বিভিন্ন কোম্পানির ব্যর্থতার ইতিহাস। পর্যবেক্ষণ করেন, কী কারণে প্রতিষ্ঠানটি সফল হতে পারেনি। পয়েন্ট নোট করেন— এসব করা যাবে না। পরে সব গুছিয়ে নিয়ে একটি আইডিয়া দাঁড় করান তিনি; তা জোড়াতালি দেয়া বটে, কিন্তু খুবই কার্যকর। একবার কেউ একজন বাফেটকে বলেছিলেন, এভাবে আরেকজনের আইডিয়া নিয়ে কাজ করা কি ঠিক? তার জবাব ছিল— সমস্যা কোথায়? পৃথিবীতে মৌলিক আইডিয়া আছে কয়টি? তার মধ্যে সফল প্রমাণ হয়েছে কয়টি? এখানে তো মূল আইডিয়ার উদ্ভাবককে অস্বীকার করছি না; বরং তার আইডিয়াকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি। প্রসঙ্গত, বিখ্যাত জ্যাজশিল্পী মাইলস ডেভিসের একটি উক্তি মাঝে মধ্যেই তুলে ধরেন তিনি। ডেভিস বলেছিলেন, মধ্যম মানের শিল্পীরা অন্যের আইডিয়া 'ধার' নেয় আর বড়রা ওটি 'চুরি' করে। বাফেট বলেন, এটি ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আগেই বলা হয়েছে, নেব্রাস্কা ফার্নিচার মার্টের (এনএফএম) প্রতিষ্ঠাতা রোজ ব্লাম্পকিনের (মিসেস বি) কথা। তার আরেকটি পরিচয় আছে। মার্কিন ব্যবসা জগতে 'ডিসকাউন্ট' (ছাড়) শব্দটির প্রচলন ঘটান তিনি। আমেরিকা থেকে এটি জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে। রোজ কিন্তু শব্দটি আবিষ্কার করেননি। তিনি এটি সঙ্গে করে এনেছিলেন রাশিয়া থেকে। সেখানকার খনি শ্রমিকদের বাজারে গিয়ে দেখেছিলেন সাধারণের তুলনায় ওই সব দোকান বেশি চলে, যেগুলোয় ঋতু বা ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানভেদে ডিসকাউন্ট দেয়া হয়। রোজ যখন ফার্নিচার ব্যবসায় নামেন, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তখন মন্দা চলছে। এনএফএমের

বিক্রি বাড়াতে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একদিন দোকানের সামনে লিখে রাখেন— 'ডিসকাউন্ট'। এর প্রথম দিনেই অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলেন। পণ্য কেনার জন্য ভিড় লেগেছিল তার দোকানে। মানুষ ধার করেও প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সব জিনিস কিনছিল বাজারের চেয়ে কম দামে পাওয়ায়। খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকেও আসছিল ক্রেতা। এমন সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী মামলা ঠুকে দেন রোজের নামে। তাদের অভিযোগ, কম দামে পণ্যসামগ্রী বেচে এনএফএম বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার বারোটা বাজাচ্ছে; অবিলম্বে এ 'ডিসকাউন্ট শপ' বন্ধ করা হোক। এরা নিউইয়র্ক থেকে নাকি নামজাদা উকিলও এনেছিলেন, যাতে রোজ কোনোমতেই জিততে না পারেন। রোজের কোনো আইনজীবী ছিল না অবশ্য। শুনানির প্রথম সপ্তাহে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ শুনলেন বিচারক। এরপর ডাকা হলো রোজকে। তিনি সরলভাবেই জানালেন, রাশিয়ায় এ ধরনের ব্যবসায়িক কৌশল আইনসিদ্ধ। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি তো কম দামে পণ্য বেচছেন না; অন্যরাই বরং অনেক বেশি দাম নিচ্ছে ক্রেতার কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও আদালত যদি বিবেচনা করেন তিনি দোষী— তার কিছু বলার নেই। বলা বাহুল্য, রোজের পক্ষেই রায় গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। যে বিচারক রায়টি দিয়েছিলেন, তিনিই পরদিন সস্ত্রীক হাজির হন এনএফএমে— ডিসকাউন্টে কার্পেট কিনতে!

ন্যাশনাল ইনডেমনিটি নামে ছোট, তবে খুবই লাভজনক এক বীমা কোম্পানি ছিল ওমাহায়। সেটি বাফেটের বাসার কাছে। এর স্বত্বাধিকারী ও সিইও ছিলেন জ্যাক রিঙ্গওয়াল্ট। কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন বলে শৈশবে জ্যাককে একটু ভয়ই পেতেন বাফেট; পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। পরে দুজনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে অবশ্য। জ্যাকের মুনাফা বাড়ানোর কৌশল ছিল দুটি। কোম্পানির খরচ যাতে না বাড়ে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। কর্মচারীরা ক্লায়েন্ট বা হবু ক্লায়েন্ট ছাড়া অন্য কাউকে কফি খাওয়ালেও সেটি তাদের বেতন থেকে কেটে রাখতেন জ্যাক। আরেকটি হলো, রেট (সুদের হার) ভালো না পেলে বীমা (পলিসি) বেচতেন না। এমনো হয়েছে, চার-পাঁচ মাস পেরিয়ে গেছে, কর্মীদের খামোখাই বেতন দিচ্ছেন; কিন্তু বীমা বেচছেন না। কারণ রেট কম! তখন সবে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কিনেছেন বাফেট। একে কীভাবে লাভজনক করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে গেছেন জ্যাকের কাছে। তিনি বললেন— ইয়াংম্যান, অর্থনীতিতে 'ব্যাড রিস্ক' বলে কোনো শব্দ নেই; আছে কেবল ব্যাড রেট। যদি বড়লোক হতে চাও, ব্যাড রেটে কখনো বীমা বেচ না। বাফেট মনে করেন, জ্যাকের ওই আইডিয়াই আজ বার্কশায়ারকে পরিণত করেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বীমা প্রতিষ্ঠানে। বাফেটের সাফল্যে জ্যাক রিঙ্গওয়াল্টও বেজায় খুশি হন। 'বয়স হয়েছে'— যুক্তিতে তিনি ন্যাশনাল ইনডেমনিটি নামের কোম্পানিটি এক রকম উপহারই দেন বাফেটকে। বাফেট বলতেন, অন্যের আইডিয়া কাজে লাগানোয় কোনো লজ্জা নেই; যদি তুমি সততার সঙ্গে এটি কর। সবার সব বিষয়ে মৌলিক ভাবনা থাকবে, এটা বাস্তবসম্মতও নয়। হিমালয়ের উচ্চতা জানতে আমাকে কি মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে হবে?

ধারকর্জ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন

কেউ কেউ প্রকাশ্যেই ওয়ারেন বাফেটকে বলেন 'কচ্ছপ'। 'কচ্ছপ' মানে খরগোশ ও কচ্ছপ গল্পের কচ্ছপটি। তার কারণ, এ লোকের সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে প্রচুর। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে অবশ্য তা থেকে ফিরে আসেন না। ভদ্রলোক মাঝে মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেন ব্যাংক থেকে। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেয়া হয় না বললেই চলে। তাও ওই ঋণ যেন তার কাছে সিন্দাবাদের ভূত; শোধ করে দেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ না নিলে কি ব্যবসা বাড়ানো যায়? ব্যবসা সম্প্রসারণের রীতিই তো— ধুমসে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেবে আর ব্যবসা করবে। তাতে লাভ হবে, লোকসান হবে; বছরে গাড়ি পাল্টাতে পারবে এক-দুবার; কয়েক বছর পরপর কিনবে নতুন

বাড়ি-অ্যাপার্টমেন্ট। এভাবেই তো জীবনে আসে গতি! ওয়ারেন বাফেট কী করেন? অনেকে মনে করে, তিনি থাকেন নিউইয়র্ক নয় তো ওয়াশিংটনে। বাস্তবতা হলো— সেই কবে ৩৪ হাজার ডলার দিয়ে একটা বাড়ি কিনেছিলেন ওমাহায়; এখনো থাকেন সেটাতেই। পয়সার অভাব নেই; অথচ কেমন কঞ্জুস! ভক্সওয়াগন বিটলস চালালেন ২০-৩০ বছর। বাতিলের আগে আবার বললেন— আরও কিছুদিন এটা চালানো যেত! দামি স্যুট পরার সাধ্য তো তার অনেক আগেই হয়েছে। অথচ এখনো ওমাহার সস্তা দোকান থেকে স্যুট কেনেন। লোকলজ্জার ভয়ে অবশ্য নিজে গিয়ে কেনেন না এখন। ড্রাইভারের হাতে স্যুট কেনার পয়সা দিয়ে নিজে বসে থাকেন গাড়িতে। এসব অভিযোগের কোনোটিই অস্বীকার করেন না বাফেট। উল্টো গর্ববোধ করেন এমন জীবনযাত্রা নিয়ে। বলেন— অনেক ব্যবসায়ীরই রাতে ঘুম হয় না শুনি। আমার সেসব সমস্যা নেই। রাতে খাবারের পর একবার ঘুমালে ভোরের আগে হুঁশ ফেরে না। আমি যদি তাদের মতো করে চলতাম, তাতে জীবনে গতি আসত বটে; কিন্তু শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম না হয়তো। আরেকটি বিষয় আছে। অনেক ব্যবসায়ীকে দেখেছি, ঋণ করে নতুন বাড়ি কিনে বিলাসী জীবনযাপন করছেন। আবার কয়েক বছর পরই মাথা হেট করে এক কাপড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে। সাধ্যের বেশি ধারকর্জ আমার ধাতে নেই; নেই মানুষ যে ধরনের উচ্চাশা নিয়ে এমনটি করে, তেমন প্রবণতাও। আমার নিয়ম হলো— সাধারণ জীবনযাপন করো, ঋণ কম নাও, সঞ্চয় করো আর বিনিয়োগ বাড়াও। তিনি বলেন, যারা ধনী হওয়ার পরামর্শ চায়, তাদের এ পরামর্শটাই দিই— সঞ্চয় করো, যাতে অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। নিরুপায় হয়ে যদি ঋণ করতেই হয়, তাহলে যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যে অ্যাফোর্ড করতে পারবে; ততটুকু নাও। বাফেট হিসাব করে দেখেছেন, কারও আর্থিক অবস্থা যত শক্তিশালীই হোক, মোট আয়ের ১৮-২০ শতাংশের বেশি ঋণ নেয়া একেবারেই উচিত নয়। ঋণের পরিমাণ এর বেশি হয়ে গেলে এবং একই সময়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিলে ওই ব্যক্তির পক্ষে এগিয়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব।

ঋণের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে একটি উদাহরণ প্রায়ই দেন বাফেট। বলেন— ওমাহার খুচরা ব্যবসায়ীরা কী উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে? অবশ্যই মুনাফা করতে। সেটির উপায়? ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য যেন বেশি থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখা। ধরুন, খুচরা ব্যবসায় প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় মুনাফা কমে গেছে। এখন ওই ক্ষুদে দোকানদার কী করবে? এক. সে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিতে পারে ব্যবসা। দুই. বুদ্ধিমান হলে পণ্য বিক্রি করবে না, উল্টো অন্য দোকানের পণ্য কিনতে ক্রেতাদের সে ডলার দিতে পারে ঋণ হিসেবে। যেহেতু ধার দিচ্ছে, এ ক্ষেত্রে খেলার নিয়ম দোকানদারের পক্ষেই থাকবে স্বভাবত। মনে করুন, সে ঋণ দিতে চায় এক-দুই-তিন সপ্তাহ মেয়াদের জন্য এবং ১০০, ২০০ ও ৩০০ ডলার করে। নিশ্চিত থাকুন, ওই দোকানি পণ্য বিক্রি করে যত না লাভ করত, পণ্য কেনার জন্য ডলার ধার দিয়ে অনেক বেশি লাভ করতে পারবে। আরেকটি কাজও করতে পারে সে। নিজেই ক্রেতাকে তার দোকানের পণ্য কিনে দেবে; ক্রেতা তাকে কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করবে সে অর্থ। এভাবে ব্যবসা করতে পারলেও কিন্তু বিপুল লাভ করতে পারবে দোকানি। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য দোকানিকে দুটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ ধরে রাখতে হবে— এক. যখন ক্রেতা ঋণ চাইবে; দুই. যখন তারা ব্যয় করবে। বাফেট বলেন— ব্যবসায়ীর পাশাপাশি আমি নিজেকে একজন সচেতন ভোক্তা বলেও মনে করি। ভোক্তা হিসেবে আমি চাই, ব্যবসায়ীর মুনাফা কম হোক। তাই খুচরা পণ্য কেনার সময় দর কষি; অর্থ সঞ্চয় করি, যাতে অন্য কেউ আমাকে ধার দেয়ার সুযোগ না পায়।

বাফেট বলেন, ব্যবসায় ঝুঁকি নেয়ার একটি রোমাঞ্চকর অনুভূতি রয়েছে। এতে সফল না হলে আবার নিজেকে 'খাটো', 'আমি কিছুই পারি না' মনে হয়। পরের অনুভূতিটি খুব বেদনাদায়ক। তাই এ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ধারকর্জ খুব একটা নিই না আমি; তার বদলে সঞ্চয় বাড়াই। এটিই আমাকে দিয়েছে সফলতা ও মানসিক শান্তি।

সফলতার জন্য সুসঙ্গ জরুরি

বাফেট মনে করেন, অভিজ্ঞতা বাড়াতে বেশি দরকার নিজের চেয়ে বড় মাপের মানুষের সাহচর্য ও সর্বোপরি সুসঙ্গ। ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের অন্যতম সূচকও এটি। কেউ যখন তার চেয়ে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় বড় মানুষের সঙ্গে মেশে, তখন ব্যক্তিটির ঝোঁক থাকে হাতের কাছে পাওয়া এ 'দৃষ্টান্ত' অনুসরণ করার; চেষ্টা থাকে আচার-আচরণেও তার মতো হওয়ার। আবার নিজের চেয়ে ক্ষুদ্রদের সঙ্গে মিশলে যথাযথ দিকনির্দেশনা হারিয়ে ফেলে মানুষ। পরিণামে হাতে পায় না কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পৌঁছতে পারে না লক্ষ্যে। বাফেট বিশ্বাস করেন, শিক্ষা-দীক্ষার পর ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা। এ দুটি বাড়াতেই সুসঙ্গ অপরিহার্য।

বিনিয়োগকারী হওয়ার ক্ষেত্রে শৈশবে বাফেটের অনুপ্রেরণা ছিলেন কিংবদন্তি মার্কিন শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড। তার একটি উক্তি এখনো স্মরণ করেন বাফেট— 'কামিং টুগেদার ইজ এ বিগিনিং, কিপিং টুগেদার ইজ প্রগ্রেস অ্যান্ড ওয়ার্কিং টুগেদার ইজ সাকসেস।' কৈশোরে কিছু বখাটে বন্ধু অবশ্য জুটেছিল বাফেটের। বাবা হাওয়ার্ড তাকে ডেকে বলেছিলেন— কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তা একান্তই তোমার বিষয়। আমি কেবল এটুকু বলতে চাই, ওসব বন্ধুর সঙ্গে মিশে সফল বিনিয়োগকারী হওয়া যাবে না; নিজের 'স্ট্যান্ডার্ড'ই কমবে কেবল। তোমার বরং উচিত এমন সব লোকের সঙ্গে মেশা— যাদের কাছ থেকে জীবনের লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রেরণা ও পাথেয় পাবে; যাদের সাহচর্য তোমার জীবনবোধকে মহৎ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আরও উন্নত করবে। হাওয়ার্ডের এ কথা

শোনার পর বাফেট ওই বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দেন। তার বদলে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন ওমাহার অভিজাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। এদের মধ্যে ছিলেন নিক নিউম্যান ও জ্যাক রিঙ্গওয়াল্ট। ন্যাশনাল ইনডেমনিটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্যাক। বাফেট তার কাছে শিখেছিলেন বীমা ব্যবসায় সহজে মুনাফা করার উপায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়্যারহাউজিং টেকনিকের উন্নয়ন ঘটান নিক। আধুনিক চেইনশপের ধারণা কিন্তু এখান থেকেই এসেছে।

ওয়াল স্ট্রিটে আসার পর বাফেট বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন বেঞ্জামিন গ্রাহাম ও চার্লস এম স্কোয়াবের সঙ্গে। গ্রাহাম তাকে পরামর্শ দেন, শেয়ারবাজারে এসেই বিনিয়োগ করবে না। কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করবে; বিচার-বিশ্লেষণ করবে; তার পর নেবে সিদ্ধান্ত। বাস্তবে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী দেরিতে আসে শেয়ারবাজারে। দেরিতে আসা এরা থাকে আগ্রাসী। এদের ভুলও হয় বেশি। তারা আসে শেয়ারবাজারে রাতারাতি বড়লোক হতে। এসেই ভাবে, দ্রুত শেয়ার লেনদেন করা গেলেই বুঝি ধনী হওয়া যাবে। তারা দেখতেও চায় না কোন শেয়ার কিনছে আর কোনটি বেচছে। সফল বিনিয়োগকারী হতে চাইলে শেয়ারবাজারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বুঝেশুনে। বাফেট বলেন, এটি শেয়ারবাজার সম্পর্কে তার পাওয়া অন্যতম মূল্যবান উপদেশ।

চার্লস এম স্কোয়াব নিজেই ছিলেন কিংবদন্তি সিইও। তার পরও বলতেন, এর সবই তিনি পেয়েছেন আরেক কিংবদন্তি শিল্পপতি অ্যান্ড্রিউ কার্নেগির কাছ থেকে। আর বাফেটকে অনুপ্রাণিত করতে স্কোয়াব তাকে নিয়ে যেতেন সেই বাড়িতে, যেখানে আড্ডা দিতেন তিন বন্ধু— ম্যাথু আর্নল্ড (লেখক), হার্বার্ট স্পেনসার (দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী) ও অ্যান্ড্রিউ কার্নেগি। স্কোয়াব তাকে দেখিয়েছিলেন সেই রুম, যেখানে দুই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রুভার ক্লিভল্যান্ড, বেঞ্জামিন হ্যারিসন ও লেখক মার্ক টোয়েনের সঙ্গে মিলে 'অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট লিগ' গঠন করেন শিল্পপতি অ্যান্ড্রিউ। সেখানে তাকে লেখা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম অ্যাওয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোনের ব্যক্তিগত চিঠিও পড়েছেন বাফেট। জেনেছেন, ১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের কাছ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে কিনেছিল ফিলিপাইন। তখন অ্যান্ড্রিউ ফিলিপিনোদের সমপরিমাণ অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, যাতে দেশটি স্বাধীনতা পায়। তবে কিছু রাজনৈতিক বিবেচনায় সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি ফিলিপিনোরা। অ্যান্ড্রিউ কার্নেগি বলতেন, সাধারণভাবে চলবে; তবে বড় কিছু করার চেষ্টা করবে। বলতেন, ওই ব্যক্তি বড় নেতা হতে পারবে না, যে সবকিছু নিজে করতে চায় অথবা সবকিছুতে নিজের কৃতিত্ব দাবি করে। আন্ড্রিউর বিখ্যাত উক্তি— ধনসম্পত্তি নিয়ে কবরে যাওয়া একজন ধনীর জন্য লজ্জাজনক। এসব এখন বাফেটেরও জীবনদর্শন। তার কাছে বন্ধু জেপি মরগানের গল্পও করতেন স্কোয়াব। মরগানের একটি কথা খুব ভালো লেগে যায় বাফেটের। মরগান বলেছিলেন, সফল ব্যবসায়ীরা দৃষ্টির শেষ সীমায় লক্ষ্যবস্তু বসায়; যাতে এটি হাসিল হলে লক্ষ্যমাত্রা আরও দূরে সরিয়ে নেয়া যায়— দৃষ্টি প্রসারিত করে। স্কোয়াব বাফেটকে বলতেন, কল্পনাশক্তি না বাড়িয়ে কেউ-ই সফল ব্যবসায়ী হতে পারে না। একসময় বাফেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় ওয়াশিংটন পোস্ট ইনকরপোরেশনের মালিক ক্যাথরিন গ্রাহামের সঙ্গে। এ বিদূষী নারীর বাড়িতে আড্ডা দিতেন অগুস্ত রঁদা (স্থাপত্যশিল্পী), মেরি কুরি, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রী ইলিনর রুজভেল্ট, রকফেলাররা, জন এফ কেনেডি, রবার্ট ম্যাকনামারা, হেনরি কিসিঞ্জার, রোনাল্ড রিগ্যানের মতো ব্যক্তি। ক্যাথরিনের সঙ্গে মেশার পর চিন্তার এক নতুন জগৎ উন্মুক্ত হয়ে যায় বাফেটের সামনে। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গেও দারুণ বন্ধুত্ব বাফেটের। গেটসের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের অন্যতম কারণ— দুজনের জীবনবোধের মিল।

সামাজিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই বেড়ে ওঠে মানুষ। এ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো সুসঙ্গ। বাফেট বলেন, এ ৮০-৮২ বছর বয়সেও চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা যে অটুট রয়েছে; তিনি যে সংগ্রাম করতে করতে ভেঙে পড়েননি, সেটির অন্যতম প্রধান কারণ তার বন্ধুরা। তাদের কাছ থেকে সব সময় অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনি; শিক্ষা নিয়েছেন এদের ধরিয়ে দেয়া ভুল থেকে। এভাবেই তৈরি হয়েছেন আজকের বিলিয়নেয়ার ওয়ারেন বাফেট। তিনি বিশ্বাস করেন, কেউ যদি সুসঙ্গ পায়, উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে; ওই ব্যক্তির যদি বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রচেষ্টা থাকে এবং সে যদি ব্যবসায় কৌশলী হয়— সাফল্য তার কাছে ধরা না দিয়ে পারে না। ওয়ারেন বাফেট বলেন, যে তত্ত্ব তার জীবনে কাজে এসেছে, সেটি ব্যবহার করে বড় হতে পারবে না কেন অন্যরা?